Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা- মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইনছানা ইসলাম

রোলঃ 23090120060

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা- মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইনছানা ইসলাম

রোলঃ 23090120060

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " পিতা- মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ইনছানা ইসলাম, আইডিঃ 23090120060 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " পিতা- মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Insana Islam

(স্বাক্ষর)

ইনছানা ইসলাম

আইডিঃ 23090120060

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

বিষয় নির্বাচনের কারন 5

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে পিতা মাতার মর্যাদা 7

পিতা-মাতার প্রতি নবী রাসুলগনের আচরন 10

নবী আদম (আ.) ও সন্তানদের আচরণ 11

নবী ইব্রাহীম (আ.) পিতা আজার 12

নবী ইসমাইল (আ.) এর আনুগত্য 13

নবী ইউসুফ (আ.) ও পিতা ইয়াকুব (আ.) 14

নবী ঈসা (আ.) এবং মাতা মারইয়াম (আ.) 15

নবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতামাতার প্রতি আচরন 17

রাসুল (স.) এর পালক মা এবং দুধ মায়ের প্রতি আচরন 18

পিতামাতার প্রতি সাহাবায়ে কেরামের আচরণ 19

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) এর ঘটনা 20

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) 21

পিতামাতার ইন্তেকালের পর তাদের হক আদায় 22

বর্তমান সমাজে সাহাবাগনের আদর্শ অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা 23

পিতামাতার মর্যাদা সম্পর্কিত কোরআনের আয়াত সমূহ 24

হাদিসের আলোকে পিতামাতার অধিকার 33

ইসলামি আইন অনুযায়ী পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব 45

বৃদ্ধ বয়সে পিতা-মাতার সেবা প্রদান 51

অবাধ্য সন্তানের দুনিয়া ও আখিরাতের শাস্তি 59

সাহাবী যুগের সেই তরুণ যার জবান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল 61

এক যুবকের অকাল মৃত্যুর ঘটনা 62

সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা এর সময়কার এক হৃদয়স্পর্শী ঘটনা 64

মৃত্যুর সময়ের কষ্ট 67
কবরের শাস্তি 71
নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগের ঘটনা 72
কবরের আযাবের প্রকৃতি 73
আখিরাতের শাস্তি 74
কেয়ামতের দিন অবাধ্য সন্তানের অবস্থা 75
পারিবারিক কাঠামো ভেঙে পড়ে 82
আধুনিক যুগে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের অবহেলার কারন বিশ্লেষণ 85
উপসংহার 93

বিষয় নির্বাচনের কারন

মানব জীবনের সূচনা ও বিকাশের প্রথম এবং প্রধান কেন্দ্র হলো পরিবার। আর পরিবারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি স্তম্ভ হলো মা ও বাবা। তাদের স্নেহ, মমতা, দিকনির্দেশনা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে সন্তান জীবনধারার পথে এগিয়ে চলে।মা বাবা এবং সন্তানের মধ্যকার সম্পর্কটা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর সম্পর্ক। এই সম্পর্কে নেই কোনো স্বার্থ, নেই কোনো খাদ।আমাদের জন্ম, বেড়ে ওঠা সবকিছুর মূল ভুমিকা জুড়েই থাকেন তারা। তাই মা-বাবার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য মানব সমাজের এক চিরন্তন ও মৌলিক নৈতিকতা। কিন্তু বর্তমান যুগে প্রযুক্তির অগ্রগতি, সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবের ফলে সন্তানদের মধ্যে এই দায়িত্ববোধ ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। এই বাস্তবতা আমাকে গভীরভাবে ভাবিয়েছে এবং এ কারণেই আমি এই বিষয়টি গবেষণার জন্য নির্বাচন করেছি।

আজকের সমাজে দেখা যায় অনেক সন্তানই মা-বাবাকে অবহেলা করে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তাদের প্রতি চরম অশ্রদ্ধা ও নির্যাতনের ঘটনাও ঘটে। বৃদ্ধ বয়সে মা-বাবা যখন সন্তানের ভালোবাসা ও সহযোগিতা সবচেয়ে বেশি আশা করেন তখন অনেক সময় তারা একাকিত্ব, বঞ্চনা ও অবহেলার শিকার হন। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাদের ঠাই হয় কোনো এক বৃদ্ধাশ্রমে।

এই সামাজিক বিপর্যয় রোধ করতে হলে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে মা-বাবার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা জরুরি।

ইসলাম এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান যা মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা অসংখ্য স্থানে মা-বাবার প্রতি সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন—

তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তারই ইবাদত করবে এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে।
(সূরা আল-ইসরা: ২৩)

রাসূলুল্লাহ ﷺ মা-বাবার সন্তুষ্টিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং তাদের প্রতি অবাধ্যতাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন।

তবে দেখা যায় অনেক মুসলমানই ইসলামী শিক্ষা থাকা সত্ত্বেও এই বিষয়ে অজ্ঞতা বা উদাসীনতার কারণে দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকে।

একটি শক্তিশালী ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের মূলভিত্তি হলো পারিবারিক বন্ধন। যদি সন্তানরা মা-বাবার প্রতি দায়িত্বশীল না হয় তবে পরিবারের ভিত নড়বড়ে হয়ে যায়। পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা থেকে সমাজে জন্ম নেয় নৈতিক অধঃপতন, অপরাধ, আত্মকেন্দ্রিকতা ও অবহেলার সংস্কৃতি।

শিক্ষা শুধু জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম নয় সেই সাথে এটি মানুষকে আদর্শ, চরিত্রবান ও দায়িত্বশীল নাগরিকে পরিণত করে।কিন্তু বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক ও পারিবারিক শিক্ষা প্রায় উপেক্ষিত। তাই মা-বাবার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়টি শিক্ষার্থীদের জন্য চর্চার যোগ্য এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আমার ব্যক্তিগত জীবনেও আমি লক্ষ্য করেছি যেসব সন্তান মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও দায়িত্বশীল হশে থাকে তারা সমাজে সফল ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করে। অপরদিকে যারা অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হয় তারা জীবনে নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়।

সার্বিকভাবে বলা যায় বর্তমান সমাজে পারিবারিক মূল্যবোধ পুনরুদ্ধার ও ইসলামী আদর্শ প্রচারের জন্য "মা-বাবার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য" শীর্ষক বিষয়টি অত্যন্ত সময়োপযোগী।

এই গবেষণার মাধ্যমে আমি ইসলামের আলোকে সন্তানদের নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব বিশ্লেষণ করতে চাই। যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পরিবার ও সমাজ উভয়ের প্রতিই দায়িত্বশীল হয়ে উঠতে পারে।আমি বিশ্বাস করি এর মাধ্যমে সমাজে মা বাবার প্রতি দায়িত্ববোধ জাগ্রত করার একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সফল হবে ইং শা আল্লাহ।

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে পিতা মাতার মর্যাদা

একদা এক ব্যক্তি আল্লাহ রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করল,হে আল্লাহর রাসুল! মানুষের মধ্যে আমার সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার পাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি হকদার কে?

আল্লাহর রাসুল (স.) বললেন, তোমার মা।

লোকটি দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করল, তারপর কে?

তিনি বললেন, তোমার মা।

সে তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করল,তারপর কে?

তিনি বললেন, তোমার মা।

এরপর যখন ওই ব্যক্তি চতুর্থবার জানতে চাইল,তারপর কে?
তখন রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার বাবা।

(সহিহ বুখারি,সহিহ মুসলিম)

এই হাদিসটি ইসলামে মা বাবার মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত গভীর শিক্ষা প্রদান করে।রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বানী আমাদের জানিয়ে দেয়, মানুষের ক্ষেত্রে সদ্ব্যবহার ও উত্তম আচরণের ক্ষেত্রে মা বাবার স্থান কতো গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষ সমাজবদ্ধ প্রাণী। তার জন্ম, বেড়ে ওঠা ও ব্যক্তিত্ব গঠনে মা-বাবার ভূমিকা অনস্বীকার্য। একজন মানুষ পৃথিবীতে প্রথম যার ভালোবাসা, ত্যাগ ও স্নেহ পায়, তারা হলেন তার পিতা-মাতা। তাই ইসলাম এই সম্পর্ককে সর্বোচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। কুরআন ও হাদীস উভয়ই বারবার পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব, কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্যের গুরুত্ব তুলে ধরেছে।

এখানে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়ের কথা তিনবার উল্লেখ করেছেন। কারন মা হলেন সন্তানের জীবনের প্রথম শিক্ষক, প্রথম ভালোবাসা ও প্রথম আশ্রয়। সন্তানকে জন্মদানের জন্য তিনি গর্ভে নয় মাস কষ্ট সহ্য করেন। তারপর সন্তান জন্মের সময় মৃত্যুযন্ত্রণা

ভোগ করেন। জন্মের পর নিদ্রাহীন রাত কাটান, সন্তানের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য নিজের সুখ ত্যাগ করেন।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন—

আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং দু'বছর দুধ পান করিয়েছে।

(সূরা লুকমান: ১৪)

রাসুলুল্লাহ ﷺ মায়ের নাম তিনবার উচ্চারণ করে বোঝালেন যে, সন্তানের জীবনে মায়ের ত্যাগ ও কষ্টই তাকে সর্বাধিক সম্মানের যোগ্য করেছে। মায়ের সন্তুষ্টি অর্জনই জান্নাতের পথ খুলে দেয়।

অন্যদিকে, বাবা পরিবারের অভিভাবক। রোজগারের মাধ্যম ও দিকনির্দেশক। তিনি নিজের কষ্ট উপেক্ষা করে সন্তানদের নিরাপত্তা, শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে পরিশ্রম করেন।

কুরআনে আল্লাহ বলেন—

তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আমার প্রতিও কৃতজ্ঞ হও।

(সূরা লুকমান: ১৪)

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—
তোমার পিতা তোমার জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা। (তিরমিজি)

অর্থাৎ যে তার পিতাকে সম্মান করে তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ হয়। বাবার দোয়া সন্তানের জীবনের জন্য বরকতের কারণ।

ইসলাম শুধু তাত্ত্বিকভাবে নয় বাস্তবভাবে বাবা-মায়ের অধিকার রক্ষা করতে নির্দেশ দিয়েছে।মা বাবার প্রতি সন্তানের কর্তব্যগুলো হলো

১/মা বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করা। কথা ও আচরণে তাদেরকে সম্মান দেখানো।

২/ শরীয়তবিরোধী আদেশ ছাড়া সর্বদা তাদের আনুগত্য করা।

৩/তাদের জন্য দোয়া করা। কুরআনে পিতা মাতার জন্য দোয়া করার কথা বলা হয়েছে।

হে আমার রব! তাদের প্রতি দয়া করো, যেমন তারা শৈশবে আমাকে লালন করেছেন।
(সূরা আল-ইসরা: আয়াত ২৪)

৪/ পিতা মাতার সেবা করা।বার্ধক্যে পিতা-মাতার যত্ন নেওয়া। তাদের প্রয়োজন পূরণ করা।

৫/ মা বাবার মৃত্যুর পর তাদের স্মরণ রাখা।তাদের জন্য নিয়মিত দান সাদকাহ করা, সওয়াবের কাজ করা, দোয়া করা।

অন্যদিকে যে ব্যক্তি পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্য হয় সে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত আছে পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে, আর আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত আছে পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে। (তিরমিজি)

অর্থাৎ, পিতা-মাতার রাগ মানে আল্লাহর রাগ। আর তাদের সন্তুষ্টি মানে আল্লাহর সন্তুষ্টি।

অবাধ্যতা হলো এমন গুনাহ যার জন্য পৃথিবীতেই শাস্তি আসতে পারে।
যে সমাজে পিতা-মাতাকে সম্মান করা হয় সে সমাজে শান্তি, মমতা ও ভালোবাসা বিরাজ করে। সন্তানরা দায়িত্বশীল হয়, পরিবারগুলো হয় দৃঢ় ও নৈতিক। অপরদিকে, যেখানে পিতা-মাতার অবমাননা হয় সেখানে পরিবার ভেঙে পড়ে, নৈতিকতা হারায়, সমাজে অবক্ষয় সৃষ্টি হয়।
ইসলাম তাই পরিবারভিত্তিক এই মূল্যবোধকে জান্নাতের চাবিকাঠি হিসেবে দেখেছে।

তাই বলা যায়, সন্তানের প্রকৃত সফলতা মা-বাবার সন্তুষ্টি অর্জনে নিহিত। তারা পৃথিবীতে আমাদের জান্নাতের পথপ্রদর্শক।
তাদের সেবা, সম্মান ও ভালোবাসাই একদিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যম। অন্যদিকে সমাজে নৈতিকতার আলোকবর্তিকা।

অতএব, আমাদের কর্তব্য হলো তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও কৃতজ্ঞ থাকা এবং সর্বদা তাদের জন্য দোয়া করা।

"হে আমার প্রভু! তাদের প্রতি দয়া করো, যেমন তারা আমাকে শৈশবে লালন করেছেন।"

পিতা-মাতার প্রতি নবী রাসুলগনের আচরন

মানব জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পর্ক হচ্ছে পিতা-মাতার সম্পর্ক। তাদের ভালোবাসা, ত্যাগ, দোয়া ও পরিশ্রমের কারণেই সন্তান বড় হয়, জ্ঞান অর্জন করে এবং সমাজে স্থান পায়। ইসলাম এই সম্পর্ককে অসীম মর্যাদা দিয়েছে। পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য শুধু সামাজিক দায়িত্ব নয়। বরং এটি এক বিশাল ইবাদত। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বারবার নির্দেশ দিয়েছেন, যেন মানুষ পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে।তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং কখনো তাদের কষ্ট না দেয়।

কুরআনের অসংখ্য আয়াতে পিতা-মাতার মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। যেমন—

তোমার রব আদেশ দিয়েছেন, তুমি কেবল তারই ইবাদত করবে এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। তাদের একজন বা উভয়েই যদি বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' পর্যন্ত বলো না, বরং তাদের সঙ্গে সম্মানজনকভাবে কথা বলো।

(সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত: ২৩)

এই নির্দেশ শুধু সাধারণ মানুষের জন্য নয়। বরং সমস্ত নবী ও রাসুলগণ তাদের জীবনে পিতা-মাতার প্রতি আদর্শ আচরণ প্রদর্শন করেছেন। তাদের জীবনের ঘটনাবলি আমাদের শেখায়, কেমনভাবে পিতা-মাতার সম্মান করতে হয়। তাদের অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকতে হয় এবং তাদের দোয়ার কত মহিমা রয়েছে।

নবী আদম (আ.) ও সন্তানদের আচরণ

নবী আদম (আ.) মানবজাতির প্রথম নবী ও প্রথম মানুষ। তিনি আদর্শ পিতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তার জীবন আমাদের শিক্ষা দেয় কিভাবে পিতা হিসেবে সন্তানদের প্রতি দয়া, সহনশীলতা এবং শিক্ষামূলক উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে একটি সঠিক পরিবার গঠন করা যায়।

নবী আদম (আ.) এর সন্তানরা,হাবীল ও কাবীলএকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা স্থাপন করেছে। আদম (আ.) তাদের সর্বদা আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলার উপদেশ দিতেন। তিনি শেখাতেন পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও সহনশীলতা বজায় রাখতে হবে এবং হিংসা বা বিদ্বেষ কখনো চলবে না। কিন্তু কাবীল হিংসার বশে হাবীলকে হত্যা করে। এই ঘটনার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই পিতার উপদেশ অমান্য করা শুধুমাত্র পিতার কষ্টের কারণ নয় বরং আত্মিক ও সামাজিক পতনের কারণ হয়ে দাড়ায়।

আদম (আ.) এর এই শিক্ষা আমাদের জানায় পিতা-মাতার কথা অবহেলার মানে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করা। পিতামাতার নির্দেশনা শুধুমাত্র পারিবারিক শান্তি রক্ষা করে না, এটি মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য অপরিহার্য। আদম (আ.) এর জীবনে প্রতিটি দিক থেকে আমরা দেখতে পাই পিতা-মাতা কখনো সন্তানের প্রতি কঠোর হয়নি। বরং তিনি ধৈর্য ও ভালোবাসার মাধ্যমে শিক্ষা দিতেন।

নবী আদম (আ.) এর উদাহরণ থেকে আমরা আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাই, সন্তানরা যে কোনও ভুল পথে গেলে পিতা-মাতার কাজ হলো তাদের ভয় দেখানো বা দমন করা নয়। বরং ভালোবাসা, উপদেশ এবং আল্লাহর নির্দেশের মাধ্যমে পথ দেখানো। আদম (আ.) এর জীবন আমাদের দেখায় পিতার দয়া ও সহনশীলতা সন্তানের নৈতিক বিকাশের জন্য অপরিহার্য।

নবী আদম (আ.) এর সন্তানদের জন্য উপদেশগুলো ছিল নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট। তিনি বলতেন পরস্পরের প্রতি দয়া ও সহমর্মিতা দেখাতে।
হিংসা, রাগ বা প্রতিশোধ কখনো গ্রহণযোগ্য নয়।আল্লাহর নির্দেশনা মেনে চলা আমাদের জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য।

কিন্তু কাবীল এই উপদেশ অমান্য করেছিল। এর ফলশ্রুতিতে হাবীল নিহত হয়। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে মানবজাতি শিখল পিতার পরামর্শ ও নির্দেশকে অবজ্ঞা করা জীবনের জন্য কতটা বিপজ্জনক।

এটি কেবল আদম (আ.) এর সময়ের ঘটনা নয়।বরং প্রতিটি যুগের পিতামাতার জন্য এটি শিক্ষণীয়। নবী আদম (আ.) এর দৃষ্টান্ত আমাদের শেখায় পিতা-মাতার উপদেশ মেনে চলা কেবল পারিবারিক শান্তি নয় বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ।

নবী ইব্রাহীম (আ.) পিতা আজার

নবী ইব্রাহিম (আ.) এর জীবনে আমরা পিতার সঙ্গে আচরণের এক মহান উদাহরণ পাই। তার পিতা আজার ছিলেন মূর্তি নির্মাতা ও উপাসক। কিন্তু ইব্রাহিম (আ.) কখনো রূঢ় বা অবজ্ঞাসূচকভাবে কথা বলেননি। বরং সর্বদা বিনয়ী, শান্ত ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

তিনি তার পিতাকে বলেছিলেন,

হে আমার পিতা! আপনি কেন এমন জিনিসের উপাসনা করছেন যা শুনতে পায় না, দেখে না, উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না?
(সূরা মরইয়াম, আয়াত: ৪২)

এখানে দেখা যায়, ইব্রাহিম (আ.) বহুবার “হে আমার পিতা” বলে সম্বোধন করেছেন। যদিও তার পিতা তাকে অস্বীকার করেছেন। এমনকি তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে চেয়েছিলেন তবুও তিনি পিতার জন্য দোয়া করেছেন।

হে আমার রব! আমার পিতাকে ক্ষমা করুন, নিশ্চয়ই সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত।
(সূরা আশ-শুয়ারা, আয়াত: ৮৬)

এটাই নবীর চরিত্র! শত্রু হলেও পিতাকে অসম্মান করেননি।
এই আচরণ আমাদের শেখায়, মতভেদ থাকা সত্ত্বেও পিতা-মাতার প্রতি ভালোবাসা ও দোয়া বন্ধ করা উচিত নয়।

নবী ইসমাইল (আ.) এর আনুগত্য

নবী ইব্রাহিম (আ.) এর পুত্র নবী ইসমাইল (আ.) ছিলেন পিতার প্রতি পরম অনুগত। যখন আল্লাহ ইব্রাহিম (আ.) কে স্বপ্নে দেখালেন যে, তাকে তার পুত্রকে কুরবানি করতে হবে। তওনি এই কথা পুত্র ইসমাইল (আ.) কে জানালে তখন ইসমাইল (আ.) কোনো আপত্তি না করে বললেন,

হে আমার পিতা! আপনি যে আদেশ পেয়েছেন তা পালন করুন। ইং শা আল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।

(সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ১০২)

এই উত্তরটি ইতিহাসের সবচেয়ে অনুগত উত্তর। ইসমাইল (আ.) পিতার প্রতি বিনয়, আস্থা ও ঈমানের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তার এই আনুগত্যের প্রতিদান হিসেবে আল্লাহ তাদের উভয়কে সম্মানিত করেছেন। এবং এই স্মৃতির প্রতীক হিসেবে আজও মুসলমানরা প্রতি বছর কুরবানির ঈদে পশু কুরবানি করে।

নবী ইসমাইল (আ.) আমাদের শেখালেন পিতা-মাতার নির্দেশে আনুগত্য মানে আল্লাহর আদেশ পালন করা।

নবী ইউসুফ (আ.) ও পিতা ইয়াকুব (আ.)

নবী ইউসুফ (আ.) ও তার পিতা নবী ইয়াকুব (আ.) এর সম্পর্ক ভালোবাসা ও ধৈর্যের এক সুন্দর দৃষ্টান্ত। ছোটবেলায় ইউসুফ (আ.) এক স্বপ্ন দেখেন, যেখানে সূর্য, চাঁদ ও এগারোটি তারা তাকে সেজদা করছে। তিনি এই স্বপ্ন পিতাকে বললে তার পিতা বলেন,

হে আমার প্রিয় সন্তান! তোমার এই স্বপ্ন তোমার ভাইদের কাছে বলো না, না হলে তারা তোমার প্রতি ষড়যন্ত্র করবে।

(সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৫)

এই উপদেশে পিতার জ্ঞান, ভালোবাসা ও দয়া স্পষ্ট। কিন্তু ভাইয়েরা হিংসায় ইউসুফকে কূপে ফেলে দেয়। পিতা ইয়াকুব (আ.) তবুও ধৈর্য ধারণ করেন। বহু বছর পর যখন ইউসুফ (আ.) মিশরের মন্ত্রী হন। তখন তিনি পিতাকে আল্লাহর আদেশে নিজের কাছে নিয়ে আসেন এবং তাদের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটে।

এই ঘটনাগুলো থেকে আমরা শিখি পিতার দোয়া সন্তানের জন্য মহামূল্যবান। পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক ধৈর্য, দয়া ও ক্ষমার ওপর দাড়িয়ে থাকে।

নবী ঈসা (আ.) এবং মাতা মারইয়াম (আ.)

নবী ঈসা (আ.)এর জন্মই ছিল এক অলৌকিক ঘটনা। তিনি কোনো পিতা ছাড়াই জন্ম নেন। কিন্তু তার মা মারইয়াম (আ.) ছিলেন চরম পবিত্র ও সম্মানিতা নারী। নবী ঈসা (আ.) ছোটবেলা থেকেই তার মায়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

কুরআনে আল্লাহ বলেন,

তিনি আমাকে আমার মায়ের প্রতি অনুগত করেছেন এবং আমাকে অবাধ্য বা দুর্ব্যবহারকারী করেননি।

(সূরা মরইয়াম, আয়াত: ৩২)

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, নবী ঈসা (আ.)-এর জীবনে মাতার প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্য ছিল আল্লাহ প্রদত্ত গুণ। তিনি কখনো মায়ের কথা অমান্য করেননি বরং তার মর্যাদা সর্বদা রক্ষা করেছেন।

নবী মুসা (আ.) ও তার মাতৃভক্তি

নবী মূসা (আ.) এর জীবন কুরআনে বারবার উল্লেখিত হয়েছে। তার জন্ম হয়েছিল ফেরাউনের রাজত্বে। সেই সময় ফেরাউন ঘোষণা দিয়েছিল, বনি ইসরাইলে কোনো পুত্র সন্তান হলেই তাকে হত্যা করা হবে। এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তার মা সন্তানকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহর নির্দেশে তাকে একটি ঝুড়িতে রেখে নদীতে ভাসিয়ে দেন।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন—

আমি মূসার মাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম তুমি তাকে দুধ পান করাও। আর যখন তার জন্য ভয় করো তখন তাকে নদীতে ফেলে দিও। এবং ভয় করো না, দুঃখ করো না।আমি তাকে তোমার কাছেই ফিরিয়ে আনব এবং তাকে নবীদের একজন করব।

(সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৭)

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, সেই নবী মূসা (আ.) পরবর্তীতে ফেরাউনের ঘরেই বড় হন। কিন্তু আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তার মা-ই আবার তাকে নিজের দুধ পান করান।

এখানে আমরা দেখতে পাই,
একজন মায়ের ঈমান, ধৈর্য ও দোয়া কেমনভাবে আল্লাহর পরিকল্পনার অংশ হয়ে যায়।
নবী মূসা (আ.) সারাজীবন তার মায়ের এই ত্যাগকে শ্রদ্ধা করেছেন। তার জীবনের এই ঘটনা শিক্ষা দেয় পিতা-মাতার ভালোবাসা আল্লাহর রহমতেরই প্রতিফলন। সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দোয়া কখনো বৃথা যায় না।

নবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতামাতার প্রতি আচরন

রাসুলুল্লাহ (সা.)এর পিতা আবদুল্লাহ তার জন্মের আগেই ইন্তেকাল করেন। আর তার মা আমিনা মারা যান তার বয়স যখন ছয় বছর। অর্থাৎ তিনি পিতামাতার ছায়া ছাড়াই বেড়ে ওঠেন। কিন্তু তার অন্তরে পিতামাতার প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা কখনো কমে যায়নি।

একদিন নবী করিম (সা.) তার মায়ের কবর জিয়ারত করেন।তখন তিনি কাঁদছিলেন এবং এতই কাঁদছিলেন যে তার চারপাশের সাহাবাগণও কাঁদতে শুরু করলেন। তিনি বললেন,

আমি আমার মায়ের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করার অনুমতি চেয়েছিলাম, কিন্তু অনুমতি পাইনি। তবে তার কবর জিয়ারতের অনুমতি পেয়েছি।

(সহিহ মুসলিম)

এই ঘটনায় বোঝা যায়, রাসুলুল্লাহ (সা.) তার মা-বাবার প্রতি কত গভীর শ্রদ্ধা ও আবেগ ধারণ করতেন। যদিও তারা জীবিত ছিলেন না। তবুও নবী (সা.) তাদের স্মরণ করেছেন।তাদের কবর পরিদর্শন করেছেন এবং উম্মতকে কবর জিয়ারতের আদব শিখিয়েছেন।

রাসুল (স.) এর পালক মা এবং দুধ মায়ের প্রতি আচরন

রাসুলুল্লাহ (সা.) এর দুধ মা ছিলেন হালিমা সাদিয়া (রা.)। তিনি নবীকে শিশু অবস্থায় দুধ পান করিয়েছিলেন এবং লালন করেছিলেন। নবী (সা.) প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরও তাকে মা বলে সম্বোধন করতেন। তার সঙ্গে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীলভাবে আচরণ করতেন।

একবার হালিমা (রা.) মক্কায় আসলে নবী (সা.) তাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাড়িয়ে তার চাদর বিছিয়ে দিলেন এবং সম্মানিত স্থানে বসালেন। আশেপাশের সাহাবারা দেখলেন নবী (সা.) কতটা বিনয়ী ও কৃতজ্ঞ তার প্রতি যিনি শৈশবে তাকে যত্নে লালন করেছিলেন।

এছাড়াও নবী (সা.) এর দুধ ভাই ও বোনদের প্রতিও তিনি স্নেহ প্রদর্শন করতেন। তিনি বলতেন,

যে ব্যক্তি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছে, আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকি।

এই আচরণ থেকে বোঝা যায়, নবী (সা.) শুধু তার নিজের মায়ের প্রতি নয় বরং যারা মাতৃত্বের দায়িত্ব নিয়েছেন তাদের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

নবী মুহাম্মদ (স.) এর দাদা, চাচার প্রতি আচরন

নবী (সা.) এর পিতা মারা যাওয়ার পর তার দাদা আবদুল মুত্তালিব তাকে নিজের সন্তানের মতো লালন করেন। নবী (সা.) দাদার প্রতি অগাধ ভালোবাসা পোষণ করতেন। দাদা মৃত্যুর পর চাচা আবু তালিব তাকে আশ্রয় দেন এবং নবী (সা.) এর নবুওয়াতের শুরু পর্যন্ত তাকে রক্ষা করেন।

যদিও আবু তালিব ইসলাম গ্রহণ করেননি তবুও নবী (সা.) তার প্রতি কখনো কৃতজ্ঞতা ভুলে যাননি। তিনি সর্বদা তার জন্য দোয়া করতেন। তার উপকারের কথা স্মরণ করতেন।

এই থেকে বোঝা যায় ইসলাম শুধু রক্তের সম্পর্ক নয়। বরং যারা লালন-পালন করেন, তাদের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন শেখায়।

পিতামাতার প্রতি সাহাবায়ে কেরামের আচরণ

ইসলাম পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্যকে ইবাদত হিসেবে বিবেচনা করেছে। কুরআনে একাধিক স্থানে আল্লাহ তাআলা পিতা-মাতার হক আদায়ের গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। যেমন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

"আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি।"

(সূরা আনকাবূতঃ ৮)

এছাড়া হাদীসে এসেছে,

"পিতা-মাতা হলো জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা।"

(তিরমিজি)

পিতা-মাতা সন্তানের জীবনের প্রথম শিক্ষক, পথপ্রদর্শক ও দোয়াকারী। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও সেবাই সন্তানের প্রকৃত সফলতা। সাহাবাগণ এ শিক্ষা তাদের জীবনে এমনভাবে বাস্তবায়ন করেছেন যা আজকের যুগের জন্যও প্রেরণার উৎস।

রাসূলুল্লাহ ﷺ পিতা-মাতার অধিকার নিয়ে অসংখ্য হাদীসে আলোচনা করেছেন। পাশাপাশি সাহাবাগণ যারা নবী (স.) এর সান্নিধ্যে থেকে ইসলামের বাস্তব আদর্শে নিজেদেরকে গড়ে তুলেছিলেন।সাহাবাগণ ছিলেন ইসলামের সর্বপ্রথম প্রজন্ম, যারা কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা বাস্তবে পালন করেছেন। তাদের জীবনে পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা, আনুগত্য, দয়া ও আত্মত্যাগের এমন নজির পাওয়া যায় যা মানব ইতিহাসে বিরল।

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) এর ঘটনা

আবু হুরাইরা (রা.) ছিলেন নবী করিম ﷺ এর বিখ্যাত সাহাবি। তিনি বলেন,

“আমি কখনো মাকে নাম ধরে ডাকিনি। সবসময় বলতাম ‘হে আমার মা, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন।’”

তার মা ইসলাম গ্রহণে অনাগ্রহী ছিলেন।ইসলাম এবং আল্লাহর রাসুল (স.) কে নিয়ে কটু কথাও বলতেন। একদিন আবু হুরাইরা (রা.) কেঁদে নবীর কাছে দোয়ার অনুরোধ করলেন। নবী করিম ﷺ তার মায়ের জন্য হেদায়াত কামনা করে দোয়া করলেন। দোয়া শেষ না হতেই তার মা ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর তিনি আরও বেশি দোয়া ও সেবা করতে থাকেন।

এটি ছিল তার মায়ের প্রতি আনুগত্য ও দয়ার জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)

ইবনে উমর (রা.)-এর জীবনে পিতা-মাতার প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টান্ত অসাধারণ। তিনি একবার মরুভূমিতে এক বৃদ্ধ বেদুইনকে দেখলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজের গাধার ওপর তাকে উঠিয়ে দিলেন, নিজের পাগড়ি খুলে তার মাথায় পরিয়ে দিলেন। লোকেরা অবাক হয়ে বলল,

“এই মানুষ তো তোমার আত্মীয় নয়!”
তিনি বললেন,

“তিনি আমার পিতার বন্ধু ছিলেন। পিতা-মাতার বন্ধুকে সম্মান করা তাদের প্রতি সদ্ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত।”

(বুখারী)

পিতামাতার ইন্তেকালের পর তাদের হক আদায়

সাহাবাগণ মনে করতেন পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও তাদের অধিকার শেষ হয় না। বরং তাদের জন্য দোয়া করা, কবর জিয়ারত করা, আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রাখা, ও পিতা-মাতার বন্ধুদের সম্মান করা এগুলো সবই তাদের হক আদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

"পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও সন্তানের দায়িত্ব আছে। তাদের জন্য দোয়া করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের অঙ্গীকার পূরণ করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা এবং তাদের বন্ধুদের সম্মান করা।"

(আবু দাউদ)

ইবনে উমর (রা.) এই হাদীস বাস্তবে পালন করতেন। তিনি তার পিতার বন্ধুদের সাথে প্রতিবার দেখা করলে বিশেষভাবে দোয়া দিতেন।

বর্তমান সমাজে সাহাবাগনের আদর্শ অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা

সাহাবাগণের জীবনে পিতা-মাতার প্রতি আচরণ ইসলামী নৈতিকতার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত। তারা আল্লাহ ও তার রাসুলের নির্দেশ মেনে পিতা-মাতার সেবা করেছেন নিঃস্বার্থভাবে। তাদের জীবনের এসব ঘটনা আমাদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস।

আজকের মুসলিম সমাজ যদি সাহাবাগণের এই আদর্শ অনুসরণ করে তাহলে পারিবারিক বন্ধন মজবুত হবে। সমাজে নৈতিকতা ফিরবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হবে।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে পিতা-মাতার হক যথাযথভাবে আদায় করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

পিতামাতার মর্যাদা সম্পর্কিত কোরআনের আয়াত সমূহ

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যে অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন তার মধ্যে পিতা-মাতা সবচেয়ে বড় নিয়ামত। মানুষের জীবনযাত্রার প্রতিটি স্তরে শিশুকাল থেকে প্রাপ্তবয়স্ক পর্যন্ত পিতা-মাতা সন্তানের জন্য ত্যাগ, ভালোবাসা ও দোয়ার এক অনন্য প্রতীক। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা অসংখ্য স্থানে পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার, সম্মান ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা পিতা-মাতার হককে নিজের হকের পরেই স্থাপন করেছেন। অর্থাৎ যেমন আল্লাহর ইবাদত অপরিহার্য তেমনি পিতা-মাতার প্রতি ইহসান করাও ঈমানের একটি বড় দাবি।

১. সুরা আল ইসরা (১৭:২৩-২৪)

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا .وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.

অর্থ:

“তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তারই ইবাদত করবে এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।
তাদের একজন বা উভয়েই যদি বার্ধক্যে তোমার নিকটে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে ‘উফ’ পর্যন্ত বলো না, তাদের ধমক দিও না, বরং তাদের সঙ্গে সম্মানজনক কথা বলো।
তাদের প্রতি দয়ার বশে নম্রতার ডানা প্রসারিত করো এবং বলো ‘হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করো, যেমন তারা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন।’”

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম তার একত্ববাদের নির্দেশ দিয়েছেন
“তোমরা কেবল তারই ইবাদত করো।”
তারপর সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন,
“পিতা-মাতার প্রতি ইহসান করো।”

এর দ্বারা বোঝা যায়, পিতা-মাতার অধিকার কত মহান। আল্লাহর ইবাদতের পরেই তাদের হক পালন করা ঈমানের দাবি।

"ইহসান" শব্দের অর্থ হলো উত্তম আচরণ, শ্রদ্ধা, স্নেহ, দয়া ও উপকার।

অর্থাৎ পিতা-মাতার প্রতি আচরণ কেবল বাধ্যতামূলক কর্তব্য নয়, বরং ভালোবাসা, দয়া ও শ্রদ্ধাভরে হতে হবে।

"উফ" শব্দটি আরবিতে সবচেয়ে ছোট কষ্ট প্রকাশকারী শব্দ।
আল্লাহ বলেছেন — 'উফ' পর্যন্ত বলো না। অর্থাৎ তাদের প্রতি বিরক্তি, ক্লান্তি বা রাগ প্রকাশ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

"ধমক দিও না" — অর্থাৎ তাদের ভুল হলেও কঠোরভাবে কথা বলো না। বরং ধৈর্য ও ভদ্রতায় বোঝাও।

"কুল্লাহুমা কওলান কারিমা"
সম্মানজনক কথা বলো।
অর্থাৎ কণ্ঠে কোমলতা, ভাষায় শ্রদ্ধা, আর মনে কৃতজ্ঞতা রাখতে হবে।

"ওয়াখফিদ লাহুমা জানাহায-জুল্লি মিনার রাহমাহ"
এটি এক অনন্য রূপক। যেমন পাখি ভালোবাসায় তার ডানা নামিয়ে দেয় তেমনি সন্তান যেন পিতা-মাতার সামনে বিনয় ও দয়ার ডানা প্রসারিত করে।

শেষে আল্লাহ তায়ালা শিখিয়েছেন এক মহান দোয়া,

"রব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সাগীরা।"

অর্থাৎ "হে আমার প্রভু! তাদের প্রতি দয়া করো, যেমন তারা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন।"

এই দোয়া শুধু মুখে বললেই হবে না , মনে আন্তরিক কৃতজ্ঞতাসহ উচ্চারণ করতে হবে।

এই আয়াতকে ইসলামি নৈতিকতার অন্যতম মূল ভিত্তি বলা হয়।

এখানে আল্লাহ তায়ালা এমনভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যেন সন্তান বুঝে নেয় পিতা-মাতার সেবা কোনো উপকার নয় বরং তা আল্লাহর আদেশ।

২. সুরা লুকমান (৩১:১৪-১৫)

وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ .وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا.

অর্থ:

“আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং তার দুধ ছাড়ানো দুই বছরে সম্পন্ন হয়। আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। শেষ প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে। আর যদি তারা তোমাকে আমার সঙ্গে কাউকে শরিক করতে বাধ্য করে, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না।কিন্তু পার্থিব জীবনে তাদের সঙ্গে সুন্দরভাবে আচরণ করবে।”

এখানে বিশেষভাবে মায়ের ত্যাগ ও পিতার কর্তব্য উভয়ই স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মা সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন “ওহনান আলা ওহনিন” — অর্থাৎ কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে। প্রতিদিন তার দেহে দুর্বলতা বাড়ে তবুও সে সন্তানকে রক্ষা করে।

তারপর সন্তান জন্মের পর দুই বছর দুধ খাওয়ানো। এই সময়ও মা অবিরত পরিশ্রম করে।

সুতরাং সন্তানের উচিত পিতা-মাতার এই ত্যাগ স্মরণ রেখে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকা।

আয়াতে বলা হয়েছে, “আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।” অর্থাৎ, আল্লাহর শোকর আদায় ও পিতা-মাতার শোকর একসঙ্গে করা হয়েছে।

এরপর আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,
যদি তারা তোমাকে শিরকে আহ্বান করে তবে তুমি তাদের কথা মানবে না। কিন্তু দুনিয়ার জীবনে তাদের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করবে।

এর দ্বারা বোঝা যায়, ঈমানের বিষয়ে আল্লাহর আদেশ অগ্রাধিকার পাবে। তবে পার্থিব জীবনে পিতা-মাতার সঙ্গে শালীন, নম্র আচরণ অবশ্যই করতে হবে। এমনকি যদি তারা কাফের বা মুশরিকও হন।

৩.সুরা আন নিসা (৪:৩৬)

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
.وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

অর্থ:

“তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তার সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক করো না। পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো।আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত, নিকটবর্তী প্রতিবেশী, দূরবর্তী প্রতিবেশী, সঙ্গী, মুসাফির এবং তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদের প্রতিও সদ্ব্যবহার করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারী ও গর্বিত ব্যক্তিকে ভালোবাসেন না।”

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানব সমাজে পারস্পরিক সম্পর্কের পূর্ণ রূপরেখা দিয়েছেন। এখানে প্রথমে একত্ববাদ বা তাওহিদের ঘোষণা করা হয়েছে,
“আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক করো না।”

এর পরপরই নির্দেশ এসেছে
“পিতা-মাতার সঙ্গে ইহসান করো।”

অর্থাৎ আল্লাহর পরে সর্বোচ্চ হক পিতা-মাতার।

“ইহসান” মানে শুধু দয়া নয় বরং সর্বোচ্চ উত্তম ব্যবহার। যেমন কথা বলায় নম্রতা, সেবায় ধৈর্য, দৃষ্টিতে শ্রদ্ধা এবং অন্তরে কৃতজ্ঞতা।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, পিতা-মাতার পাশাপাশি আল্লাহ আত্মীয়স্বজন, এতিম, দরিদ্র, প্রতিবেশী, মুসাফির প্রভৃতি সকলের অধিকার উল্লেখ করেছেন।
এর দ্বারা বোঝা যায় ইসলাম কেবল আল্লাহর ইবাদতের ধর্ম নয়। এটি একটি সামাজিক ন্যায়ের পথও।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে,
“আল্লাহ অহংকারী ও গর্বিত ব্যক্তিকে ভালোবাসেন না।”
অর্থাৎ যে সন্তান নিজের ধন, জ্ঞান বা মর্যাদা নিয়ে পিতা-মাতার সামনে অহংকার করে সে আল্লাহর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়।

৪.সুরা আল আহকাফ (৪৬:১৫)

وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

অর্থ:

“আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের মধ্যে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্টের মধ্যেই প্রসব করেছে।গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানোর সময় মিলিয়ে ত্রিশ মাস।
যখন সে পূর্ণ বয়স্ক হয় এবং চল্লিশ বছরে পৌছে যায় তখন সে বলে, ‘হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে অনুপ্রেরণা দাও যাতে আমি তোমার প্রদত্ত নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং এমন সৎকর্ম করি যা তুমি পছন্দ করো। আমার সন্তানদেরকেও সৎ করো। নিশ্চয়ই আমি তোমার দিকে ফিরে এসেছি এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।’”

এই আয়াতে পিতা-মাতার ত্যাগের বর্ণনা এবং কৃতজ্ঞ সন্তানের দোয়া একসঙ্গে এসেছে।

মা গর্ভধারণে ও প্রসবে কষ্ট ভোগ করেন। সন্তান জন্মের পরও যত্নে ঘুম ত্যাগ করেন, খাবার ভুলে যান, শুধু সন্তানের সুখের চিন্তায় দিন কাটান।

"ত্রিশ মাস" কথাটির ব্যাখ্যা করেছেন তাফসিরকারগণ এভাবে,গর্ভকাল ৬ মাস এবং দুধ ছাড়ানোর সময় ২৪ মাস, মোট ৩০ মাস।
সন্তান যখন ৪০ বছরে পৌঁছে যায়, তখন সাধারণত পরিপূর্ণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে। তখন তার দায়িত্ব হয় নিজ জীবনের দিকে ফিরে তাকিয়ে আল্লাহর শোকর আদায় করা এবং পিতা-মাতার ত্যাগ স্মরণ করে তাদের জন্য দোয়া করা।

আয়াতে যে দোয়া বলা হয়েছে, তা এক মুমিন সন্তানের মনের প্রতিচ্ছবি।

"হে আমার রব! আমাকে এমন অনুপ্রেরণা দাও যেন আমি তোমার অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ।"

এই দোয়া শেখায়, পিতা-মাতার নিয়ামতও আল্লাহর নিয়ামতের অন্তর্ভুক্ত।

এরপর সন্তানের জন্য দোয়া,

"আমার সন্তানের মধ্যে সৎকর্ম সৃষ্টি করো।"

অর্থাৎ, একজন সত্যিকার মুমিন চায় যেন তার পরবর্তী প্রজন্মও পিতা-মাতার মতোই ধার্মিক, দয়ালু ও আল্লাহভীরু হয়।

৫.সুরা আল আনকাবুত (২৯:৮)

وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ.

অর্থ:
"আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছি। আর যদি তারা তোমাকে আমার সঙ্গে এমন কিছুকে শরিক করতে বাধ্য করে যার কোনো জ্ঞান তোমার নেই,

তবে তাদের কথা মানবে না। তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে, এবং আমি তোমাদের কাজের সংবাদ জানিয়ে দেব।"

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা দুইটি মৌলিক নীতি শিক্ষা দিয়েছেন

এক. পিতা-মাতার সঙ্গে সুন্দর আচরণ করো।

দুই. ঈমানের ব্যাপারে কোনো ছাড় নয়।

যদি পিতা-মাতা সন্তানকে ইসলামের পরিপন্থী কোনো কাজে আহ্বান করে তবুও সন্তান তাদের সঙ্গে অসদাচরণ করতে পারবে না।

এটি ইসলামি ভারসাম্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। আল্লাহর আদেশ অগ্রগণ্য কিন্তু পার্থিব জীবনে মানবিক সম্পর্কেও সর্বোচ্চ নৈতিকতা বজায় রাখতে হবে।

৬. সুরা মারইয়াম (১৯:১৪)
নবী ইয়াহইয়া (আ.)

وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا.

অর্থ:

"তিনি (ইয়াহইয়া আ.) ছিলেন তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারকারী, এবং উদ্ধত বা অবাধ্য ছিলেন না।"

আল্লাহ তায়ালা নবী ইয়াহইয়া (আ.) এর চরিত্রের প্রশংসা করতে গিয়ে প্রথমেই বলেছেন, তিনি তার পিতা-মাতার প্রতি "বির্র" বা সদ্ব্যবহারকারী ছিলেন।

"বির্র" শব্দটি শুধু বাহ্যিক আচরণ নয় বরং অন্তরের ভালোবাসা, দোয়া, ও কর্তব্যনিষ্ঠ সেবাকে বোঝায়।

তার বিপরীতে বলা হয়েছে, "জাব্বারান অসিয়া" অর্থাৎ উদ্ধত ও অবাধ্য ছিলেন না।
যার মানে পিতা-মাতার আদেশ অমান্য করা, রূঢ় আচরণ করা বা অহংকার করা নবীসুলভ চরিত্রের বিপরীত।

৭. সুরা মারইয়াম (১৯:৩২)
নবী ঈসা (আ.)

.وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا

অর্থ:

“তিনি আমাকে আমার মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহারকারী করেছেন এবং আমাকে উদ্ধত ও দুর্ভাগা করেননি।”

নবী ঈসা (আ.) ছিলেন একমাত্র আল্লাহপ্রদত্ত অলৌকিক জন্মের নবী।যার কোনো পার্থিব পিতা ছিল না।
তবুও তিনি নিজের জীবনের প্রথম ঘোষণাতেই বলেন,
“আমার রব আমাকে আমার মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহারকারী করেছেন।”

এতে বোঝা যায় যে মা একাই হোন বা পিতা-মাতা উভয়ই থাকুন তাদের প্রতি ইহসান করা ঈমানের মৌলিক অংশ।

এখানে “জাব্বারান শাকিয়্যা” শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ
উদ্ধত ও অকল্যাণকারী নয়। বরং বিনয়ী, দয়ালু ও সুখী।
অর্থাৎ পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতে সৌভাগ্যবান করে।

৮.সুরা আল বাকারা (২:৮৩)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.

অর্থ:
“আর যখন আমি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।”

এখানে আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তী জাতির সঙ্গে করা অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তারা যেন শুধু আল্লাহর উপাসনা করে এবং পিতা-মাতার সঙ্গে ভালো আচরণ করে।

অর্থাৎ পিতা-মাতার মর্যাদা কেবল ইসলামী শরীয়তে নয়। পূর্ববর্তী সব আসমানী শরীয়তে এ নির্দেশ ছিল।

যারা এ আদেশ অমান্য করেছে তাদের পরিণতি হয়েছে ধ্বংস।যেমন বনী ইসরাঈল নিজেদের অহংকারে নবীদের হত্যা করেছিল, পিতা-মাতার অবাধ্য হয়েছিল, ফলে তারা আল্লাহর গজবের মুখে পড়ে।

হাদিসের আলোকে পিতামাতার অধিকার

মানব জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হলো পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক। আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের জন্য হিদায়াতের পথ নির্ধারণ করেছেন। যাতে মানুষ তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক দিকনির্দেশনা অনুসরণ করতে পারে। ইসলামে পিতামাতার প্রতি সম্মান, আনুগত্য ও সেবা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কুরআনের পর হাদীসেও অসংখ্যবার পিতামাতার অধিকার ও মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণীসমূহে এমনভাবে পিতামাতার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে যে, তা শুনলে যে কোনো মুসলিমের হৃদয় কোমল হয়ে যায় এবং নিজের পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে গভীর সচেতনতা জন্ম নেয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন

“আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে পিতামাতার সন্তুষ্টিতে, আর আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে পিতামাতার অসন্তুষ্টিতে।”

(তিরমিজি, ইবন মাজাহ)

এই হাদীসটি স্পষ্ট করে দেয় যে পিতামাতার সন্তুষ্টি অর্জন করা মানে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আর তাদের অসন্তুষ্টি মানে আল্লাহর রোষানলে পড়া। তাই ইসলামে পিতামাতার অধিকার কেবল সামাজিক দায়িত্ব নয়। বরং এটি এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় দায়িত্ব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন,

“সবচেয়ে বড় গুনাহগুলোর একটি হলো মানুষ তার পিতা-মাতার অবাধ্য হয়।”

(বুখারি ও মুসলিম)

এই হাদীসের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, পিতামাতার অবাধ্যতা শুধু নৈতিক অপরাধ নয়।এটি আল্লাহর কাছে অন্যতম মহাগুনাহ। এমনকি নবী ﷺ একে শিরকের পরেই সবচেয়ে বড় গুনাহ হিসেবে গণ্য করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ পিতামাতার সেবা ও দোয়ার ওপর এত গুরুত্ব দিয়েছেন যে, এমনকি তারা মৃত্যুবরণ করলেও তাদের অধিকার শেষ হয় না। এক সাহাবি নবী ﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন,

“হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা মারা গেছেন, এখন তাদের প্রতি কি কোনো সেবা বা দায়িত্ব বাকি আছে?”

নবী ﷺ বললেন,“হ্যা, তাদের জন্য দোয়া করা, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা, তাদের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের বন্ধুদের সম্মান করা।”

(আবু দাউদ)

এই হাদীসের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি, পিতামাতার অধিকার তাদের মৃত্যুর পরও বিদ্যমান। তাদের জন্য ইস্তিগফার করা, দোয়া করা, সদকা করা, তাদের নামে সওয়াবের কাজ করা এসবও ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তানের কর্তব্য।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরেকটি হাদীসে বলেন,

“একজন ব্যক্তি জীবদ্দশায় কিংবা মৃত্যুর পর পিতা-মাতার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলে জান্নাত তার জন্য হারাম হয়ে যায়।”

(সহীহ হাদীস, আহমাদ)

এই ভয়াবহ সতর্কবার্তা আমাদের জানিয়ে দেয় যে পিতামাতার অবাধ্যতা ও তাদের কষ্ট দেওয়া শুধু পৃথিবীর শাস্তি নয় আখিরাতেও জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ হতে পারে।

নবী ﷺ এর জীবনে এমন অনেক ঘটনা আছে যেখানে তিনি পিতামাতার অধিকার বাস্তবে কিভাবে আদায় করতে হয় তা শিক্ষা দিয়েছেন।

একবার একজন ব্যক্তি নবী ﷺ এর কাছে এসে বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আমি হিজরতের জন্য বের হয়েছি অথচ আমার পিতা-মাতা কাঁদছেন।” নবী ﷺ বললেন,
“তুমি ফিরে যাও, তাদেরকে হাসাও যেমনভাবে তুমি তাদের কাঁদিয়েছিলে।”

(আবু দাউদ, নাসাঈ)

এই হাদীসটি অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী। নবী ﷺ দেখিয়েছেন পিতামাতার হৃদয়ে দুঃখ দেওয়া আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় নয়। বরং তাদের হৃদয় শান্ত রাখা, তাদের খুশি রাখা সন্তানের জন্য ইবাদতের সমান।

একটি বিখ্যাত হাদীসে নবী ﷺ বলেন,
"তোমার মা-বাবা উভয়েই যদি জীবিত থাকে, তবে তুমি তাদের সেবা করার মাধ্যমে জান্নাত লাভের সুযোগ পেয়েছ।"

(সহীহ হাদীস, মুসলিম)

অর্থাৎ, যতদিন পিতা-মাতা জীবিত আছেন ততদিন সন্তান জান্নাতের দরজা খোলা অবস্থায় পেয়ে থাকে। তাদের মৃত্যুর পর সেই দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তাই একজন বুদ্ধিমান মুমিন কখনোই এই সুযোগ হারাতে চায় না।

আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,
"যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় পিতা-মাতার সেবা করে তার জন্য জান্নাতের দুটি দরজা খোলা থাকে। আর যদি তারা একজন জীবিত থাকে তবুও একটি দরজা খোলা থাকে। যদি সে অবাধ্য হয় তবে জান্নাতের দুটি দরজা বন্ধ হয়ে যায়।"

(বায়হাকি)

এই হাদীসটি আমাদের জানিয়ে দেয়, পিতামাতার সেবা শুধু দুনিয়ার কল্যাণ নয় বরং জান্নাতের চাবিকাঠি।

পিতামাতার অধিকার সম্পর্কে নবী ﷺ একবার সাহাবাদের সামনে এমনভাবে বলেছিলেন যা শোনে তারা বিস্মিত হয়েছিলেন। এক ব্যক্তি বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। আমি তাকে কাধে নিয়ে হজ করিয়েছি। তবুও কি আমি তার হক আদায় করেছি?"
নবী ﷺ বললেন,"না, তুমি তার একটি আর্তনাদেরও প্রতিদান দিতে পারনি যা সে তোমাকে জন্মের সময় দিয়েছিল।"

(বায়হাকি)

এই হাদীসটি আমাদের শেখায় মায়ের অধিকার এমন যে, জীবনের সমস্ত সেবা দিয়েও তার একটি রাতের কষ্টের প্রতিদান দেওয়া সম্ভব নয়।

নবী ﷺ পিতামাতার প্রতি অসদাচরণের পরিণতি নিয়েও সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন,

"তিন প্রকার ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ দৃষ্টিপাত করবেন না।

(১) পিতামাতার অবাধ্য সন্তান
(২) নারীদের নকল করে পুরুষ
(৩) অন্যের প্রতি অহংকার প্রদর্শনকারী।"

(নাসাঈ)

অর্থাৎ এমন সন্তান আল্লাহর রহমত ও দয়ার দৃষ্টিতেও আসবে না।

পিতামাতার অধিকার শুধু তাদের জীবদ্দশায় দোয়া করা বা সেবা করা নয় বরং তাদের মানসিক প্রশান্তি রক্ষা করাও ইসলামের শিক্ষা। নবী ﷺ বলেছেন,
"তুমি যদি তোমার পিতা-মাতার পাশে বসো, তাদের দিকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকাও, তাহলে আল্লাহ তোমার জন্য এক হজের সওয়াব লিখে দেন।"

(বায়হাকি)

অর্থাৎ শুধু ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকানোও ইবাদত হয়ে যায়।যদি তা হয় পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দিয়ে।

পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব কেবল তাদের শারীরিক সেবা বা খাবার দেওয়াই নয়। ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে পিতামাতার মানসিক ও আত্মিক প্রশান্তিও সন্তানের দায়িত্ব।

নবী ﷺ বলেছেন,

"যে ব্যক্তি পিতামাতার প্রতি সদাচরণ করে, তাদের খুশি রাখে, তাদের কষ্ট দূর করে, আল্লাহ তার জীবন দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ করে দেন।"

(তিরমিজি)

পিতামাতার প্রতি ভালো আচরণ আল্লাহর দৃষ্টিতে এমন এক সওয়াব যা শুধু আখিরাতে নয় দুনিয়াতেও মঙ্গল বয়ে আনে। তাই একজন সন্তানকে সর্বদা সচেতন থাকতে হবে যেন তার আচরণ পিতামাতার প্রতি সদাচার ও শ্রদ্ধাশীল হয়।

নবী ﷺ এর জীবনে এমন বহু উদাহরণ আছে যেখানে তিনি পিতামাতার প্রতি শ্রীদ্ধা ও নম্রতার চূড়ান্ত উদাহরণ স্থাপন করেছেন। একবার তিনি ﷺ নিজেই খেজুরের ব্যাগ বহন করছিলেন এবং তার সন্তানেরাও সেখানে সাহায্য করছিলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন পিতা-মাতার কাছে সেবা করার সুযোগ এসেছে, তখন তিনি নিজের সুবিধা বা আরাম ত্যাগ করে তাদের খুশি করতে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

“যে ব্যক্তি তার পিতামাতার জন্য একটি নরম কথা বলে, আল্লাহ তার জন্য হাজার সদকার সওয়াব লিখেন।”

(মুসলিম)

এই হাদীসের মাধ্যমে বোঝা যায় পিতামাতার প্রতি ছোটো ভালো আচরণও আল্লাহর কাছে অনেক বড় সওয়াব বহন করে। তাই প্রতিদিনের ছোট ছোট কথাবার্তায়, আচরণে সন্তানের দায়িত্ব গুরুত্বপূর্ণ।

পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে তাদের বয়সের প্রয়োজন অনুযায়ী যত্ন নেওয়া।

নবী ﷺ বলেছেন,

“যে ব্যক্তি বৃদ্ধ পিতামাতার সঙ্গে সহমর্মিতা করে, তাদের প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করে, আল্লাহ তার জন্য সকল দুঃখ দূর করেন।”

(ইবন মাজাহ)

পিতামাতার অধিকার পূর্ণ করার অন্যতম অংশ হলো তাদের দোয়া করা। নবী ﷺ বলেন,

“সন্তান তার পিতামাতার জন্য প্রতিদিন অন্তত একটি সুদৃষ্টি দোয়া করলে, আল্লাহ তা গ্রহণ করেন এবং তার জীবনে বরকত দেন।”

(বুখারি)

পিতামাতার প্রতি সদাচরণের মাধ্যমে সন্তান শুধু তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করে না বরং তার নিজের চরিত্র ও নৈতিকতার বিকাশ ঘটে। ইসলামের শিক্ষায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, পিতামাতার অধিকার আদায় করা এক ধরণের ইবাদত। এমনকি হাদীসগুলোতে বলা হয়েছে, পিতামাতার প্রতি অবমাননা বা কষ্ট দেওয়া সব ধরনের ইবাদত ধ্বংস করে দিতে পারে।

একটি বিখ্যাত হাদীসে নবী ﷺ বলেন,

“যে ব্যক্তি পিতামাতাকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের দরজা বন্ধ করে দেন।”

(মুসলিম)

এখানেই বোঝা যায় পিতামাতার অধিকার কখনো অবহেলা করা যায় না। এমনকি ছোট ছোট অবহেলা ও অবাধ্যতাও সন্তানের জন্য বড় ক্ষতি বয়ে আনে।

পিতামাতার অধিকার সম্বন্ধে নবী ﷺ আরও বলেন,

“একজন সন্তান যতক্ষণ পর্যন্ত পিতামাতার সম্মান ও অধিকার রক্ষা করে, আল্লাহ তাকে সঠিক পথে চলার শক্তি দেন। আর যিনি তা অবহেলা করেন, তিনি আত্মার অন্ধকারে পতিত হন।”

(বুখারি ও মুসলিম)

সন্তান পিতামাতার প্রতি তার অধিকার আদায় করতে পারে তাদের প্রাপ্য সম্মান দেখিয়ে, দোয়া ও সদকা করে এবং তাদের জন্য ধৈর্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন করে।

নবী ﷺ বলেছেন,

“যে ব্যক্তি তার পিতামাতার জন্য প্রতিদিন একটি সদকাসহ দোয়া করে, আল্লাহ তার জন্য সকল দুঃখ হ্রাস করেন।”

(আবু দাউদ)

পিতামাতার অধিকার শুধু সন্তানদের দায়িত্ব নয় বরং এটি সামাজিক ও নৈতিক জীবনেরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, পিতামাতার সন্তুষ্টি অর্জন করা মানে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

একবার নবী ﷺ বলেছেন,

“যে ব্যক্তি পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তাদের খুশি রাখে, তাদের সাথে সদাচরণ করে, সে জান্নাতের অধিকারী।”

(বুখারি)

পিতামাতার অধিকার আদায় করা জীবনের প্রতিটি স্তরে গুরুত্বপূর্ণ।

নবী ﷺ বলেছেন,
“সন্তান যদি তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণ করে, তাদের খুশি রাখে, তাদের কষ্ট দূর করে, আল্লাহ তার সব কাজে বরকত দেন।”
(মুসলিম)

এই হাদীসগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি যে পিতামাতার অধিকার আদায় করা শুধু সামাজিক দায়বদ্ধতা নয়।বরং এটি আখিরাতের সফলতার চাবিকাঠি। পিতামাতার প্রতি সদাচরণ, তাদের খুশি রাখা, তাদের প্রয়োজন মেটানো, দোয়া ও সদকা করা এগুলো সবই ইসলামের মূল শিক্ষা।

পিতামাতার অধিকার শুধুমাত্র তাদের জীবদ্দশায় সীমাবদ্ধ নয়। নবী ﷺ শিক্ষা দিয়েছেন, তাদের মৃত্যু পরেও সন্তানের দায়িত্ব অব্যাহত থাকে। পিতামাতার জন্য দোয়া, ইস্তিগফার, সদকা ও নেক কাজ করা এসবও তাদের অধিকার আদায়ের অংশ।

এক হাদীসে নবী ﷺ বলেন,

“যে ব্যক্তি তার মৃত পিতামাতার জন্য ইস্তিগফার ও সদকা করে, আল্লাহ তা গ্রহণ করে এবং মৃত পিতামাতার জন্যও এটি সওয়াব হিসেবে লিখে দেন।”

(মুসলিম)

সন্তান যদি তার পিতামাতার জন্য দোয়া করে আল্লাহ তা কবুল করেন। নবী ﷺ বলেন,
“সন্তান তার পিতামাতার জন্য দোয়া করলে, যা সে তার জন্য চায় তা আল্লাহ তাৎক্ষণিকভাবে কবুল করেন।”

(তিরমিজি)

পিতামাতার অধিকার আদায়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো তাদের প্রতি সদাচরণ এবং ভালো ব্যবহার।

নবী ﷺ বলেন,
“যে ব্যক্তি তার পিতামাতার সঙ্গে সদাচরণ করে, আল্লাহ তার সব কাজ সহজ করে দেন এবং তার জীবনে বরকত দেন।”

(বুখারি)

পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া সন্তানের চরিত্রে মানবিক গুণাবলী বৃদ্ধি করে। হাদীসে এসেছে,
“একজন সন্তানের নেক কার্যকলাপ তার পিতামাতার সম্মান রক্ষার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত।”

(আবু দাউদ)

সন্তান যেন পিতামাতার প্রতি অমর্যাদাকর আচরণ না করে তা নবী ﷺ বারবার উল্লেখ করেছেন। একবার তিনি ﷺ বলেন,
“যে ব্যক্তি তার পিতামাতার সঙ্গে কঠোর বা কটু আচরণ করে, আল্লাহ তার সমস্ত নেক কাজ বাতিল করে দেন।”
(মুসলিম)

এছাড়া নবী ﷺ এর জীবনে এমন অনেক ঘটনা আছে যেখানে তিনি পিতামাতার সঙ্গে সদাচরণ, খুশি রাখা ও তাদের প্রয়োজন মেটানোর মাধ্যমে আদর্শ স্থাপন করেছেন। একবার তিনি ﷺ একজন বৃদ্ধাকে সহায়তা করেছেন, যার পিতামাতার বয়স অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি তাদের পাশে বসে কথা বলেছেন, তাদের দোয়া নিয়েছেন এবং তাদের খুশি করার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

পিতামাতার অধিকার সম্পর্কে নবী ﷺ বলেন,
“যে ব্যক্তি তার পিতামাতার জন্য এক মুহূর্তেরও সহমর্মিতা প্রদর্শন করে, আল্লাহ তার জন্য প্রতিটি দিন এক নবীর মতো সওয়াব লিখেন।”

(বুখারি)

পিতামাতার অধিকার শুধুমাত্র ভালবাসা বা দোয়া দিয়ে সীমাবদ্ধ নয়। নবী ﷺ বলেন,
“যে সন্তান তার পিতামাতার প্রাপ্য সম্মান ও আরাম নিশ্চিত করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেন।”
(মুসলিম)

পিতামাতার অধিকার পূর্ণ করতে সন্তানকে তাদের প্রয়োজনে সাহায্য করতে হয়, তাদের খুশি রাখতে হয়, তাদের কষ্ট কমাতে হয় এবং সর্বোপরি তাদের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হয়।

এক হাদীসে এসেছে,
“যে ব্যক্তি তার পিতামাতার জন্য সদকা, ইস্তিগফার এবং দোয়া করে, আল্লাহ তা গ্রহণ করে এবং তার জীবনে বরকত দেন।”
(তিরমিজি)

নবী ﷺ বলেছেন,
“পিতামাতার অধিকার রক্ষা করা শুধুমাত্র তাদের সুখের জন্য নয়। এটি সন্তানের আত্মার জন্যও কল্যাণ বয়ে আনে।”
(আবু দাউদ)

একবার নবী ﷺ বলেন,
“সন্তান যদি তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণ ও সেবা করে, আল্লাহ তার জীবনের প্রতিটি ব্যর্থতা দূর করে দেন এবং তার জীবনে প্রশান্তি সৃষ্টি করেন।”
(মুসলিম)

পিতামাতার অধিকার আদায় করা একধরণের ইবাদত। যে সন্তান তার পিতামাতার খুশি রাখে, তাদের জন্য দোয়া ও সদকা করে, তাদের কষ্ট দূর করে, আল্লাহ তার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সাফল্য প্রদান করেন।

নবী ﷺ আরও বলেছেন,
“যে সন্তান তার পিতামাতার অধিকার পূর্ণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের দু’দরজা খুলে দেন।”
(বায়হাকি)

এখান থেকেই বোঝা যায়, পিতামাতার প্রতি সদাচরণ ও তাদের অধিকার পূর্ণ করা এমন একটি দায়িত্ব যা সন্তানের আখিরাতের জীবনেও প্রভাব ফেলে। পিতামাতার প্রতি অবাধ্যতা বা কষ্ট দেওয়া আল্লাহর নৈকট্য থেকে দূরে ঠেলে দেয়।

পিতামাতার অধিকার আদায়ে সন্তানের মনোভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নবী ﷺ বলেছেন,
“যে সন্তান তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণ করে, তাদের খুশি রাখে, তাদের কষ্ট দূর করে, আল্লাহ তার সব দুঃখ দূর করেন এবং তার জীবনকে শান্তিময় করেন।”
(মুসলিম)

এই হাদীস আমাদের শেখায় যে, পিতামাতার প্রতি সদাচরণ শুধু নৈতিক দায়িত্ব নয়। বরং তা আল্লাহর দৃষ্টি ও বরকতের উৎস। সন্তানের জন্য এটি আখিরাতের জীবনে সফলতার চাবিকাঠি।

পিতামাতার প্রতি সদাচরণে প্রতিদিনের ছোট ছোট কাজেরও গুরুত্ব আছে। নবী ﷺ বলেন,
“যে সন্তান তার পিতামাতার জন্য প্রতিদিন একটি ভালো কথা বলে, আল্লাহ তা গ্রহণ করেন এবং তার জন্য নেক কাজ হিসেবে লিখে দেন।”
(তিরমিজি)

পিতামাতার অধিকার পূর্ণ করতে সন্তানকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, বৃদ্ধ বয়সে তাদের দেখাশোনা করা, প্রয়োজনীয় খাওয়াদাওয়া, চিকিৎসা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এগুলোই ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সন্তানের দায়িত্ব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,
"যে ব্যক্তি তার বৃদ্ধ পিতামাতার পাশে ধৈর্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন করে, আল্লাহ তার জীবনের প্রতিটি সমস্যা দূর করে দেন এবং তাকে জান্নাতের পথ দেখান।"
(আবু দাউদ)

পিতামাতার প্রতি অবাধ্যতা বা কষ্ট দেওয়া শুধু আল্লাহর রোষ ডেকে আনে না বরং সন্তানের নিজের চরিত্রও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এক হাদীসে নবী ﷺ বলেন,
"যে সন্তান তার পিতামাতার প্রতি কৃপণ বা কটু আচরণ করে, আল্লাহ তার নেক কাজ বাতিল করেন।"
(মুসলিম)

পিতামাতার অধিকার শুধুমাত্র দুনিয়ার জন্য নয়, আখিরাতেও এর প্রভাব ব্যাপক। নবী ﷺ বলেন,
"যে সন্তান তার পিতামাতার জন্য সদকা, দোয়া ও খুশি রাখে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেন।"
(বুখারি)

একবার নবী ﷺ বলেছেন,
"সন্তান যদি তার পিতামাতার খুশি রাখতে পারে, তবে আল্লাহ তার প্রতিটি পদক্ষেপকে সহজ করে দেন।"
(তিরমিজি)

পিতামাতার অধিকার আদায়ের মধ্যে অন্যতম হলো তাদের মৃত্যু পরও দোয়া ও ইস্তিগফার করা। নবী ﷺ বলেছেন,
"যে ব্যক্তি তার মৃত পিতামাতার জন্য ইস্তিগফার ও সদকা করে, আল্লাহ তা কবুল করেন এবং মৃত পিতামাতার জন্যও সওয়াব লিখে দেন।"
(মুসলিম)

পিতামাতার অধিকার আদায়ে সন্তানের মনোভাব অবশ্যই আন্তরিক ও সৎ হতে হবে। কোনো শিশুর বা বয়স্ক সন্তানের পক্ষ থেকে যখন পিতামাতার জন্য দোয়া, সদকা বা সাহায্য করা হয়, তখন তা আল্লাহর নৈকট্য ও বরকতের উৎস হয়।

নবী ﷺ বলেছেন,
"যে ব্যক্তি তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণ করে, আল্লাহ তার জীবনের প্রতিটি বিপদ দূর করেন এবং তার জীবনে প্রশান্তি দেন।"
(আবু দাউদ)

পিতামাতার অধিকার আদায়ের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তাদের সামাজিক সম্মান রক্ষা করা। নবী ﷺ বলেন,
"যে সন্তান তার পিতামাতার সম্মান বজায় রাখে, তাদের খুশি রাখে এবং তাদের কষ্ট কমায়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের দু'দরজা খুলে দেন।"
(বায়হাকি)

পিতামাতার অধিকার আদায়ে সন্তানের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ। নবী ﷺ বলেছেন,
"যে ব্যক্তি পিতামাতার প্রতি সদাচরণ করে, তাদের খুশি রাখে, তাদের কষ্ট দূর করে, আল্লাহ তার জীবনের প্রতিটি দিনকে বরকতময় করে দেন।"
(মুসলিম)

পিতামাতার প্রতি সদাচরণের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো তাদের জন্য দোয়া করা। নবী ﷺ বলেন,
"সন্তান তার পিতামাতার জন্য প্রতিদিন অন্তত একটি দোয়া করলে, আল্লাহ তা কবুল করেন এবং সন্তানের জীবনে বরকত দেন।"
(বুখারি)

অতএব পিতামাতার অধিকার আদায় করা কেবল নৈতিক দায়িত্ব নয়। বরং এটি আখিরাতের জীবনে সফলতার চাবিকাঠি। সন্তানের জন্য পিতামাতার সন্তুষ্টি অর্জন করা মানে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

ইসলামি আইন অনুযায়ী পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব

মানুষের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কগুলোর মধ্যে একটি হলো সন্তান ও পিতামাতার সম্পর্ক। ইসলামের বিধান অনুযায়ী এই সম্পর্ক শুধুমাত্র পারিবারিক নয় বরং আধ্যাত্মিক ও নৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। কোরআন ও হাদিসে পিতামাতার মর্যাদা ও তাদের প্রতি সন্তানের দায়িত্বের বিষয়ে বহুবার আলোকপাত করা হয়েছে। পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব পালন না করা কেবল একটি সামাজিক ত্রুটি নয়। বরং আল্লাহর আনুগত্যে বাধা হিসেবে বিবেচিত হয়।

সন্তান যখন জন্ম নেয়, তখন তার জীবন শুরু হয় পিতামাতার স্নেহ, যত্ন ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে। ইসলামে পিতামাতার অধিকারকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা কোরআনে নির্দেশ দিয়েছেন,
"তোমার প্রতিপালকের প্রতি ভক্তি বজায় রাখার পরও তোমার মা-বাবার প্রতি সদাচরণ কর।" (সূরা আল-ইসরাঃ ২৩)।

এটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, পিতামাতার প্রতি ভালো আচরণ আল্লাহর আজ্ঞা পূরণের একটি অপরিহার্য অংশ।

নবী করিম (সা.) আমাদের জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে এই আদর্শ অনুসরণের দিকনির্দেশ দিয়েছেন। শুধু পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেই হবে না বরং তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা, সেবা ও মননশীলতা প্রদর্শন করাও দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্বকে ইসলামী আইন বা ফিকহে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি কেবল নৈতিক বা সামাজিক দায়বদ্ধতা নয় বরং আইনগত দিক থেকেও সন্তানকে বাধ্য করে পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব পালনে। ফিকহে বলা হয়েছে, সন্তানকে তাদের বয়স ও সক্ষমতার অনুযায়ী পিতামাতার সম্মান ও সেবা নিশ্চিত করতে হবে।

সন্তানের দায়িত্বের মধ্যে অন্যতম হলো:

১. সম্মান প্রদর্শন: পিতামাতার সাথে সদাচরণ করা এবং তাদেরকে অবজ্ঞা না করা।
২. অর্থনৈতিক সহায়তা: যদি পিতামাতা অসহায় বা দরিদ্র হন তাহলে তাদের খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

৩. মানসিক ও আধ্যাত্মিক সহায়তা: তাদের সুখ-দুঃখের সময় ধৈর্য প্রদর্শন করা এবং দোয়া করা।
৪. আদর্শ আচরণ: সমাজে এবং পারিবারিক জীবনে পিতামাতার সম্মান রক্ষা করা।

নবী মুহাম্মদ (সা.) এর জীবন থেকে আমরা দেখতে পাই, তিনি কিভাবে পিতামাতার প্রতি আদর্শ আচরণ করেছেন। তিনি শুধু সম্মান প্রদর্শন করতেন না বরং তাদের যেকোনো প্রয়োজনে সাহায্য করতেন এবং ধৈর্য ও ভালোবাসার সঙ্গে তাদের সঙ্গে জীবন যাপন করতেন। সাহাবাগণও এই আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন। অনেক সাহাবী তাদের পিতামাতার বৃদ্ধাবস্থায় নিজ হাত দিয়ে সেবা করতেন। তাদের সুখ-দুঃখে সহমর্মিতা দেখাতেন এবং তাদের জন্য দোয়া করতেন।

আধুনিক সমাজে নানা কারণে সন্তানের পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব পালন অনেক সময় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। ব্যস্ত জীবন, প্রযুক্তি ও সামাজিক মাধ্যমের প্রভাব, পারিবারিক চাপ এসব কারণে অনেকেই মা-বাবার প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিতে পারেন না। কিন্তু ইসলামের দিক থেকে সন্তানের দায়িত্ব কখনো কমানো যায় না। সন্তানকে উচিত নিয়মিত সময় দেওয়া, প্রয়োজনমত আর্থিক সহায়তা প্রদান, মানসিক সমর্থন এবং দোয়া করা।

পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সন্তান শুধু তাদের শান্তি ও সুখ নিশ্চিত করে না। বরং আল্লাহর সন্তুষ্টিও অর্জন করে। এটি একটি ধারাবাহিক দায়িত্ব যা সন্তানের জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে পালন করা প্রয়োজন। আল্লাহর আজ্ঞা অনুযায়ী সন্তানের দায়িত্ব হলো পিতামাতার মর্যাদা রক্ষা করা। তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা প্রদান এবং তাদের প্রতি সদাচরণ করা।

সন্তান যখন এই দায়িত্ব পালন করে তখন তার জীবনে বরকত আসে। পরিবারে শান্তি, পারিবারিক সম্পর্ক দৃঢ় হয় এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ভালো দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়। ইসলামী সমাজে এই দায়িত্ব শুধুমাত্র আদেশমাফিক আচরণ নয় বরং একটি সামাজিক ও আধ্যাত্মিক দায়বদ্ধতা হিসেবে বিবেচিত হয়।

ইসলামে পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব কেবল আদেশমাফিক আচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। নবী করিম (সা.) তার জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিতামাতার প্রতি বিনয়, সহানুভূতি ও সেবা প্রদর্শন করতেন। তার পিতা 'আবদুল্লাহ' মৃত হওয়ার পর তিনি তার মায়ের সেবা ও সম্মানকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি মায়ের দুঃখ ও কষ্ট বোঝার জন্য ধৈর্যশীল ছিলেন এবং সব সময় তার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করতেন।

সাহাবাগণের জীবন থেকেও আমরা শিখতে পারি কিভাবে সন্তানরা পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব পালন করতেন। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) প্রমাণ করেছেন যে, তিনি তার পিতামাতার বৃদ্ধাবস্থায় নিজের হাত দিয়ে তাদের সেবা করতেন এবং তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য দিতেন। এমনকি সাহাবাগণও সর্বদা পিতামাতার প্রতি আদেশমাফিক আচরণকে সামাজিক মর্যাদার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন।

আজকের দিনে সন্তানদের পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব পালন অনেক সময় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। আধুনিক জীবনের ব্যস্ততা, অর্থনৈতিক চাপ, প্রযুক্তি ও সামাজিক মাধ্যমের প্রভাব এসব কারণে অনেক সন্তানই মা-বাবার প্রতি যথাযথ সময় দিতে পারেন না। তবে ইসলামের দিক থেকে সন্তানের দায়িত্ব কখনো হ্রাস পায় না।

সন্তানের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে পরিবারে শান্তি ও মিলন আসে। পিতামাতার প্রতি সৎ আচরণ সন্তানের জীবনে বরকত ও শান্তি আনে।

কোরআনে আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন,

“তোমার প্রতিপালকের প্রতি ভক্তি বজায় রাখার পরও তোমার মা-বাবার প্রতি সদাচরণ কর।” (সূরা আল-ইসরাঃ ২৩)।

এটি প্রমাণ করে যে সন্তানের জীবনে পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব কেবল পারিবারিক নয়, আধ্যাত্মিক দায়িত্বও।

পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব পালনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তাদের সুখ-দুঃখে সহমর্মিতা দেখানো। মা-বাবা বৃদ্ধ বয়সে বা অসুস্থ হলে তাদের যত্ন নেওয়া, প্রয়োজন অনুযায়ী চিকিৎসা প্রদান করা এবং তাদের সঙ্গে ধৈর্য ও ভালোবাসার সঙ্গে আচরণ করা সন্তানের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব কেবল নৈতিক নয় এটি আল্লাহর কাছে সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমও।

সন্তানের জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো পিতামাতার প্রতি ধৈর্য ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। পিতামাতা যদি কোনো ভুল করেন তাহলেও সন্তানের দায়িত্ব হলো তাদের প্রতি সদাচরণ বজায় রাখা। ইসলামে এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদিসে নবী করিম (সা.) বলেছেন, “যদি তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি চাও তাহলে পিতামাতার সন্তুষ্টি অর্জন কর।”

সন্তান যখন এই দায়িত্ব পালন করে তখন সে পরিবারে এবং সমাজে ভালো দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব পালনের ফলে পরিবারের সকল সদস্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্মান ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। এটি পরবর্তী প্রজন্মকেও শিক্ষা দেয় কিভাবে পরিবারে শান্তি, সম্মান ও সমৃদ্ধি বজায় রাখা যায়।

পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব শুধু তাদের সুখ-সুবিধা নিশ্চিত করে না, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হিসেবেও কাজ করে। এটি একটি ধারাবাহিক দায়িত্ব যা সন্তানের জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে পালন করা প্রয়োজন।

মানুষের জীবনে পিতামাতার স্থান এমন যে, তাদের জন্য সন্তানের যত ভালোবাসা ও ত্যাগই হোক তা কখনো যথেষ্ট হয় না। পিতা-মাতা সন্তানের জন্মের দিন থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তাদের সুখ, স্বপ্ন, ত্যাগ ও কষ্টের প্রতিচ্ছবি। ইসলাম এই ভালোবাসাকে শুধু আবেগ নয় বরং ইবাদতের মর্যাদা দিয়েছে।

সন্তান যখন ছোট থাকে তখন মা-বাবা তার জন্য রাত জেগে তার যত্ন করেন।হাসি মুখে সকল কষ্ট সহ্য করেন।নিজের প্রয়োজন বাদ দিয়ে সন্তানের প্রয়োজন পূরণ করেন। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সন্তান বড় হলে তার কর্তব্য হলো সেই ত্যাগ ও মমতার প্রতিদান দেওয়া সেবা, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার মাধ্যমে।

আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেন,

“আমি মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করেছে, এবং দুই বছর দুধ খাওয়িয়েছে।” (সূরা লুকমান: ১৪)

এই আয়াতে স্পষ্ট যে, পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব কোনো ঐচ্ছিক বিষয় নয়। এটি আল্লাহর আদেশ। যে সন্তান পিতামাতার অবাধ্য হয় সে আসলে আল্লাহর অবাধ্য।

নবী করিম (সা.) বলেন,

“আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত আছে পিতামাতার সন্তুষ্টিতে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত আছে পিতামাতার অসন্তুষ্টিতে।” (তিরমিজি)

অর্থাৎ যদি পিতামাতা সন্তুষ্ট হন তাহলে আল্লাহও সন্তুষ্ট। আর যদি পিতামাতা রুষ্ট হন আল্লাহও রুষ্ট হন। এ কারণেই ইসলামে সন্তানের জন্য পিতামাতার সেবা ও তাদের প্রতি নম্র আচরণকে এক প্রকার ইবাদত বলা হয়েছে।

সন্তানের দায়িত্ব কেবল পিতামাতার সামনে ভালো আচরণে সীমাবদ্ধ নয়। বরং তাদের অনুপস্থিতিতেও তাদের সম্মান রক্ষা করা। তাদের মৃত্যুর পর তাদের আত্মার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করা, তাদের কবর জিয়ারত করা, তাদের অসমাপ্ত ভালো কাজ চালিয়ে যাওয়াসবই সন্তানের দায়িত্বের অংশ।

হাদিসে এসেছে, নবী করিম (সা.) বলেছেন,

"মানুষ মারা গেলে তার সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি জিনিস ছাড়া।সাদকায়ে জারিয়া, উপকারী জ্ঞান এবং নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।" (সহিহ মুসলিম)

এই হাদিস স্পষ্ট করে যে নেক সন্তানের দোয়া পিতামাতার জন্য মৃত্যুর পরও উপকার বয়ে আনে। অর্থাৎ সন্তানের দায়িত্ব কেবল এই জীবনের জন্য নয় পরকাল পর্যন্ত বিস্তৃত।

অনেক সময় দেখা যায় সন্তানেরা জীবনে সফলতা অর্জন করার পর পিতামাতাকে ভুলে যায় বা তাদের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে। অথচ ইসলামে এটি বড় গুনাহ। পিতামাতা বৃদ্ধ হলে বা অসুস্থ হলে তাদের পাশে থাকা, সময় দেওয়া এবং যত্ন নেওয়া সন্তানের ঈমানের নিদর্শন।

ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তানের কর্তব্য হলো আজীবন পিতামাতার জন্য দোয়া করা, তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষা করা, তাদের কথায় নম্র থাকা এবং কখনো তাদের কষ্ট না দেওয়া।

পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্বের মধ্যে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো কথাবার্তায় শালীনতা ও নম্রতা।

কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

"তুমি তাদের প্রতি উফ পর্যন্ত বলো না এবং তাদের ধমক দিও না।বরং তাদের সঙ্গে সম্মানজনকভাবে কথা বলো।" (সূরা আল-ইসরাঃ ২৩)

এখানে "উফ" শব্দটি এমন ক্ষুদ্রতম অবাধ্যতাকেও নিষেধ করেছে। অর্থাৎ পিতামাতার প্রতি কোনো রকম রূঢ়তা, অশ্রদ্ধা বা বিরক্তির প্রকাশ ইসলাম অনুমোদন করে না।

যদি পিতামাতা কোনো ভুল করেন বা কোনো বিষয়ে মতভেদ হয় তাহলেও সন্তানের কর্তব্য হলো ধৈর্য ধরা এবং বিনয়ের সঙ্গে কথা বলা। পিতামাতার মতের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করা যায়। ল কিন্তু অসম্মান করা যায় না।

ইসলামী আইন অনুযায়ী যদি কোনো পিতা বা মাতা অসুস্থ বা অসহায় অবস্থায় থাকে তবে সন্তানের ওপর তাদের রক্ষণাবেক্ষণ বাধ্যতামূলক। এমনকি যদি সন্তান দরিদ্রও হয় তবুও সামর্থ্য অনুযায়ী সেবা করতে হবে। ইসলামী ফিকহে এটিকে "নাফাকা" (খরচের দায়িত্ব) বলা হয়।

আধুনিক সমাজে দেখা যায় অনেক সময় বৃদ্ধ মা-বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এটি ইসলামী দৃষ্টিতে কঠোরভাবে নিন্দনীয়। ইসলাম বলে যত কষ্টই হোক, যত ব্যস্ততাই থাকুক মা-বাবার পাশে থাকা, তাদের সম্মান করা, তাদের মুখে হাসি ফোটানোই সন্তানের প্রকৃত কর্তব্য।

মা-বাবার সেবা করার মাধ্যমে সন্তানের জীবনে বরকত আসে। তাদের দোয়া সন্তানের রিজিক বৃদ্ধি করে, বিপদ থেকে রক্ষা করে এবং জীবনে শান্তি আনে। অনেক সময় মা-বাবার মুখের দোয়া সন্তানের ভাগ্যই পরিবর্তন করে দেয়।

পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য শুধুমাত্র সামাজিক সম্পর্ক নয় এটি ঈমানের অঙ্গ। যে ব্যক্তি পিতামাতার অবাধ্য তার নামাজ, রোজা, ইবাদত সবকিছুর ফল কমে যায়।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

"তিন ব্যক্তির দিকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকাবেন না -যে ব্যক্তি পিতামাতার অবাধ্য, মদ্যপানকারী ও মিথ্যাবাদী।" (সহিহ বুখারি)

এ থেকেই বোঝা যায় পিতামাতার প্রতি অবাধ্যতা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ।

বৃদ্ধ বয়সে পিতা-মাতার সেবা প্রদান

বৃদ্ধ বয়সে পিতা মাতার সেবা সন্তানের জন্য একটি নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব। এ বয়সে মানুষ শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে, কর্মক্ষমতা হারায়, এবং মানসিকভাবে সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। জীবনের এই পর্যায়ে তারা তাদের সন্তানদের ভালোবাসা, যত্ন ও সহানুভূতি প্রত্যাশা করে। তারা যেভাবে সন্তানদের শৈশবে পরম স্নেহে লালন করেছেন, বার্ধক্যে এসে সেই সন্তানদের কর্তব্য হয়ে পড়ে পিতা মাতার পাশে থেকে তাদের সান্ত্বনা ও সেবা করা। ইসলাম এই দায়িত্বকে ইবাদতের মর্যাদা দিয়েছে। কারণ আল্লাহ তায়ালা পিতা মাতার সন্তুষ্টিকে নিজের সন্তুষ্টির সঙ্গে যুক্ত করেছেন।

পিতা মাতার বার্ধক্যকাল এমন একটি সময় যখন তাদের চিন্তাশক্তি, স্মৃতি ও মনোযোগ দুর্বল হয়ে যায়। অনেক সময় তারা ছোট ছোট বিষয়ে কষ্ট পান। অল্প কথায় অভিমান করেন বা অতীত স্মৃতিতে হারিয়ে যান। এই মানসিক পরিবর্তন স্বাভাবিক।কারণ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মস্তিষ্কে নানা পরিবর্তন ঘটে। এই অবস্থায় সন্তানদের ধৈর্য ধরতে হয়।তাদের কথায় মনোযোগ দিতে হয় এবং এমনভাবে আচরণ করতে হয় যেন তারা আবার নতুন করে ভালোবাসা অনুভব করেন। তাদের অনুভূতি ও সম্মান বজায় রাখা সন্তানের নৈতিক দায়িত্ব।

বর্তমান সমাজে দেখা যায় কর্মব্যস্ততা ও আধুনিক জীবনের চাপের কারণে অনেক সন্তান পিতা মাতার প্রতি অবহেলা করে বসে। কেউ কেউ তাদের বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে, কেউ বা আলাদা করে দেয়। অথচ এ সময়টিই ছিল তাদের পাশে থাকার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সময়। যারা একসময় সন্তানদের জন্য নিদ্রাহীন রাত কাটিয়েছে, নিজের স্বপ্ন ত্যাগ করেছে, সেই পিতা মাতার পাশে না থাকা এক ভয়াবহ অকৃতজ্ঞতা।

ইসলামের দৃষ্টিতে বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা কেবল দান বা দয়া নয় এটা ন্যায্য কর্তব্য। সন্তান যদি এই দায়িত্ব অবহেলা করে তবে সে বড় গোনাহগার হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি পিতা মাতার জীবদ্দশায় তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করে না অথচ তারা বৃদ্ধ হয়ে যায়, সে ধ্বংস হোক।”
এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা করার সুযোগ আসা নিজেই একটি নিয়ামত।

বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা করার অর্থ শুধু তাদের শারীরিক চাহিদা পূরণ নয়। বরং তাদের মানসিক প্রশান্তি নিশ্চিত করাও। অনেক সময় দেখা যায়, বৃদ্ধরা নিজেরা খেতে পারেন না, চলতে পারেন না, আবার অনেক সময় কোনো কিছুতেই আগ্রহ বোধ করেন না। সন্তানদের

উচিত তখন ধৈর্যসহকারে তাদের যত্ন নেওয়া, নিয়মিত তাদের সঙ্গে সময় কাটানো, গল্প করা, তাদের মতামত শোনা। এসব ছোট ছোট আচরণ তাদের জীবনের মান বাড়ায় এবং হৃদয়ে শান্তি আনে।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে পিতা মাতার সেবার উদাহরণ প্রচুর। সাহাবায়ে কেরামের জীবনে এমন বহু ঘটনা পাওয়া যায় যেখানে তারা বৃদ্ধ পিতা মাতার খিদমতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। কেউ কেউ মায়ের মুখে খাবার তুলে দিয়েছেন, কেউ রাত জেগে ওজু করিয়েছেন, কেউ বাবার পায়ের কাছে বসে থেকেছেন যতক্ষণ না তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। এই উদাহরণগুলো মুসলমানদের জন্য চিরন্তন দৃষ্টান্ত।

আজকের সমাজে এই মূল্যবোধ ক্রমশ বিলুপ্ত হচ্ছে। প্রযুক্তি ও কর্মজীবনের ব্যস্ততা মানুষকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে। সন্তানরা বিদেশে চলে যাচ্ছে, পিতা মাতা পড়ে থাকছেন নিঃসঙ্গতায়। এই একাকিত্ব তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় কষ্ট হয়ে দাড়ায়। সন্তানের দায়িত্ব শুধু অর্থ পাঠানো নয়। তাদের সময় দেওয়া, ভালোবাসা দেওয়া এবং মানসিক সাপোর্ট প্রদান করা। কারণ পিতা মাতার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন অর্থ নয়, সন্তানের সান্নিধ্য।

পিতা মাতার সেবা শুধু দুনিয়ার কাজ নয় আখিরাতের সাফল্যেরও কারণ। আল্লাহ তায়ালা যেসব আমল দ্বারা বান্দার গুনাহ মাফ করেন তার মধ্যে পিতা মাতার সন্তুষ্টি অন্যতম। যে সন্তান পিতা মাতার প্রতি দয়া ও সহানুভূতিশীল, আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই বরকতময় করেন। আর যে তাদের অবহেলা করে, তার জীবনে বরকত উঠে যায়, দোয়ার দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

বৃদ্ধ পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব শুধু ছেলে বা মেয়ের নয়, উভয়েরই। মেয়ে বিবাহিত হলেও তার কর্তব্য থাকে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা, খোজ নেওয়া এবং প্রয়োজনে পাশে থাকা। ইসলাম পরিবার ব্যবস্থাকে পারস্পরিক সহানুভূতির উপর দাড় করিয়েছে। তাই পিতা মাতার যত্ন নেওয়া মানে সমাজে মমতার সংস্কৃতি গড়ে তোলা।

বৃদ্ধ বয়সে পিতা মাতার শারীরিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মানসিক পরিবর্তনও ঘটে। বয়স বাড়লে মানুষের মন শিশুদের মতো সংবেদনশীল হয়ে যায়। তারা সহজেই কষ্ট পান, সামান্য কথায়ও অপমানিত বোধ করেন, আবার অকারণে কান্না বা রাগও করে ফেলেন। এই সময় সন্তানদের উচিত তাদের আচরণ বুঝে নেওয়া এবং রূঢ়তা না দেখানো। সন্তানদের উচিত ধৈর্যশীল থাকা। কারণ এই ধৈর্যই তাদের জান্নাতের দিকে নিয়ে যেতে পারে। বৃদ্ধ পিতা মাতার

সঙ্গে নম্র ব্যবহার, হাসিমুখে কথা বলা এবং তাদের সম্মান বজায় রাখা সন্তানের জন্য সওয়াবের কাজ।

যে সমাজে সন্তানরা পিতা মাতার সেবা করতে গর্ববোধ করে, সে সমাজ কখনো নৈতিকভাবে পতিত হয় না। কিন্তু আজকের সমাজে দেখা যায় অনেকেই বৃদ্ধ পিতা মাতাকে বোঝা মনে করে। কেউ কেউ মনে করে বৃদ্ধ মা-বাবার যত্ন নেওয়া তাদের জীবনের অগ্রগতির পথে বাধা। এই চিন্তাধারা এক ভয়াবহ মানবিক সংকটের পরিচায়ক। পিতা মাতা কখনোই বোঝা নয়, তারা সন্তানের জীবনের ভিত্তি। তাদের দোয়া ছাড়া সন্তানের সাফল্য অসম্পূর্ণ।

বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা করার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো আবেগীয় সহায়তা। এই বয়সে তারা একাকিত্বে ভোগেন, বিশেষ করে যখন সন্তানরা দূরে থাকে বা ব্যস্ত থাকে। তখন তাদের মনে হয় তারা আর প্রয়োজনীয় নন। এই অনুভূতি তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। সন্তান যদি নিয়মিত ফোন করে, সময় পেলে দেখা করে বা একটু গল্প করে, তাতেই তাদের মন ভরে যায়। কথায় আছে, "একটু ভালোবাসা বৃদ্ধদের জীবনের ওষুধ।"

বৃদ্ধ পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব শুধুমাত্র বস্তুগত সাহায্য নয় বরং তাদের সঙ্গে মানসিক সম্পর্ক রক্ষা করা আরও গুরুত্বপূর্ণ। তাদের জীবনের শেষ সময়ে সন্তানের উপস্থিতি ও যত্নই তাদের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান। তাদের প্রয়োজন অনেক সময় খুবই ছোট যেমন, কারো সঙ্গে বসে গল্প করা, কেউ তাদের কথা শুনছে এমন অনুভূতি পাওয়া, একসাথে খাবার খাওয়া, বা তাদের কোনো পুরনো স্মৃতি নিয়ে আলোচনা করা। এসব ছোট ছোট বিষয়ই তাদের জীবনের মান বাড়িয়ে দেয়।

ইসলামী ইতিহাসে দেখা যায়, সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীনরা বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা করার ক্ষেত্রে অসাধারণ উদাহরণ রেখে গেছেন। কেউ কেউ মায়ের জন্য পানিতে ওজু করাতেন, কেউ নিজ হাতে খাওয়াতেন, কেউ পিতা মাতার পায়ের নিচে বসে থাকতেন। এদের জীবনের প্রতিটি দিক থেকে বোঝা যায়, সেবার মধ্যে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও আনুগত্য কত গভীরভাবে প্রোথিত ছিল। আজকের প্রজন্ম যদি এই মানসিকতা গ্রহণ করে, তাহলে পারিবারিক বন্ধন আরও দৃঢ় হবে।

আধুনিক যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মানুষের আয়ু বেড়েছে, কিন্তু বৃদ্ধদের মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার জায়গা সংকুচিত হয়ে পড়েছে। অনেক দেশে বৃদ্ধাশ্রম গড়ে উঠেছে। যেখানে তারা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী জীবন কাটাচ্ছেন। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এটি এক প্রকার বঞ্চনা। কারণ পিতা মাতার সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা হলো সন্তানদের

কাছে থাকা। ইসলামে পরিবারই হলো মানুষের প্রাকৃতিক আশ্রয়স্থল, যেখানে বৃদ্ধরা স্নেহ ও সম্মান পেয়ে জীবনযাপন করতে পারেন।

বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবায় নারীদের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মা ও বোনেরা ঘরের ভেতর যত্ন ও পরিচর্যার মাধ্যমে এক অনন্য পরিবেশ সৃষ্টি করেন। একজন মেয়ে যদি নিজের পিতা মাতার খোজ রাখে, নিয়মিত দেখা করে, প্রয়োজনে পাশে থাকে, তাহলে সেটা ইসলামী দৃষ্টিতে মহান সওয়াবের কাজ। এমনকি বিবাহিত অবস্থায়ও মেয়ের দায়িত্ব থাকে পিতা মাতার খোজ নেওয়া। ইসলামে বিবাহের পরও মায়ের প্রতি দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না।

বৃদ্ধদের সেবা করা মানে শুধু তাদের বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করা নয় বরং তাদের মর্যাদার সংরক্ষণও নিশ্চিত করা। বয়স বাড়লে অনেকেই নিজের মূল্যবোধ নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়েন। মনে করেন তারা পরিবারের জন্য অপ্রয়োজনীয়। সন্তানদের আচরণ তখন তাদের মনে আশা বা হতাশা জাগায়। যদি সন্তানরা তাদের সম্মান দেয়, মতামত নেয়, ছোট বিষয়ে পরামর্শ চায়, তাহলে তারা অনুভব করেন যে তারা এখনও পরিবারের অংশ। এই মানসিক প্রশান্তি তাদের জীবনের শেষ সময়কে শান্তিময় করে তোলে।

বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবার মাধ্যমে সন্তান আসলে নিজের ভবিষ্যৎও সুরক্ষিত করে। কারণ একদিন তিনিও বৃদ্ধ হবেন। তখন তার সন্তানেরা তার সঙ্গে সেই আচরণ করবে যা সে তার পিতা মাতার সঙ্গে করেছে। এটি আল্লাহর একটি ন্যায্য নিয়ম "যেমন করবে, তেমনি ফল পাবে।" তাই আজ যারা পিতা মাতার প্রতি দয়া ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, ভবিষ্যতে তারাও সেই ভালোবাসার প্রতিদান পাবে।

পিতা মাতার সেবার সঙ্গে দোয়ার সম্পর্ক গভীরভাবে জড়িত। একজন বৃদ্ধ মা বা বাবার মুখে সন্তানের জন্য দোয়া বের হলে তা আল্লাহ তায়ালার দরবারে সরাসরি গৃহীত হয়। এই দোয়া সন্তানের জীবনে বরকত আনে, বিপদ দূর করে, এবং রিজিক বাড়ায়। তাই যে সন্তান পিতা মাতার সেবা করে সে শুধু তাদের খুশি করছে না বরং নিজের জীবনকেও সফলতার পথে নিয়ে যাচ্ছে।

বৃদ্ধ বয়সে পিতা মাতার সেবা শুধু পারিবারিক দায়িত্ব নয় বরং সামাজিক স্থিতিশীলতার অন্যতম উপাদান। একটি পরিবার তখনই ভারসাম্যপূর্ণ হয় যখন সেখানে প্রজন্মের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও স্নেহের সম্পর্ক বজায় থাকে। পিতা মাতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যেও নৈতিকতা সৃষ্টি করে। যদি সন্তান দেখে তার পিতা বা মাতা নিজেদের বৃদ্ধ পিতা মাতাকে যত্ন

করছে, তাহলে সেই সন্তানও ভবিষ্যতে একইভাবে আচরণ করতে শিখবে। এই শিক্ষাটি বই থেকে আসে না, আসে জীবনের উদাহরণ থেকে। তাই পিতা মাতার সেবা শুধু ব্যক্তিগত ইবাদত নয় এটি এক প্রকার সামাজিক শিক্ষাও বটে।

বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা করার মধ্যে অনেক সময় কষ্ট ও ত্যাগ জড়িত থাকে। কেউ হয়তো নিজের কাজের সময় কমিয়ে তাদের জন্য সময় দেয়, কেউ বা আর্থিকভাবে সহযোগিতা করে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এই কষ্টই হচ্ছে প্রকৃত সৌভাগ্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজের পিতা মাতার সেবায় ক্লান্ত হয়, তার জন্য জান্নাত নিশ্চিত।" এই হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, যত কষ্টই হোক পিতা মাতার খিদমত কখনো বৃথা যায় না।

আজকের যুগে প্রযুক্তি যেমন জীবন সহজ করেছে তেমনি মানুষকে বিচ্ছিন্নও করেছে। সন্তানরা অনেক সময় বিদেশে থাকে, কাজের ব্যস্ততায় পিতা মাতার সঙ্গে দেখা হয় না মাসের পর মাস। এই দূরত্ব পিতা মাতার মনে শূন্যতা সৃষ্টি করে। তাই দূরে থাকলেও নিয়মিত যোগাযোগ রাখা, ভিডিও কলে কথা বলা, প্রয়োজন বুঝে অর্থ পাঠানো এবং মানসিক সাপোর্ট দেওয়া এগুলোও সেবারই অংশ। ইসলাম শুধু শারীরিক উপস্থিতিকে সেবা বলে না।বরং নিয়ত ও হৃদয়ের ভালোবাসাকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছে।

অনেক সময় দেখা যায় বৃদ্ধ পিতা মাতার স্বাস্থ্যের অবনতি হয়।তারা নিজে খেতে বা চলতে পারেন না। এই অবস্থায় সন্তানদের দায়িত্ব হয় তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, ওষুধের নিয়ম দেখা এবং এমন পরিবেশ তৈরি করা যেখানে তারা আরামবোধ করবেন। কেউ যদি পিতা মাতার পা ধোওয়ায়, খাওয়ায় বা বিছানা ঠিক করে সেটিও মহান সওয়াবের কাজ। আল্লাহ তায়ালা এমন সন্তানকে দুনিয়া ও আখিরাতে পুরস্কৃত করেন।

বৃদ্ধ পিতা মাতার সঙ্গে বসবাসের সময় কখনো কখনো মতবিরোধও হতে পারে। তারা অতীতের চিন্তাভাবনায় অভ্যস্ত থাকেন যা আধুনিক প্রজন্মের চিন্তার সঙ্গে মেলে না। এই অবস্থায় সন্তানদের উচিত নরমভাবে কথা বলা। যুক্তি দিয়ে বোঝানো কিন্তু কোনো অবস্থাতেই অসম্মান না করা। কুরআনে এসেছে, "তাদের সঙ্গে সম্মানজনকভাবে কথা বলো।" অর্থাৎ বিতর্কের সময়ও ভদ্রতা বজায় রাখতে হবে। কারণ বৃদ্ধরা সন্তানের কাছ থেকে শুধু সম্মান ও মমতা চান,বিতর্ক নয়।

পিতা মাতার সেবা করার মাধ্যমে মানুষ নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে পারে। যারা পিতা মাতার সেবা করে, তাদের মধ্যে বিনয়, ধৈর্য, ও কৃতজ্ঞতার গুণ বিকশিত হয়। তারা বুঝতে পারে জীবনের প্রকৃত মানে ত্যাগ ও ভালোবাসায় নিহিত। অন্যদিকে যারা অবহেলা করে,

তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে যায়, তারা জীবনের প্রতি কৃতজ্ঞতা হারিয়ে ফেলে। তাই সেবা শুধু একটি দায়িত্ব নয় এটি আত্মশুদ্ধির পথও।

পিতা মাতার সেবা করার সময় অনেকেই মনে করেন তারা তাদের ঋণ শোধ করছেন। কিন্তু বাস্তবে এই ঋণ কখনো শোধ হয় না। মানুষ নিজের জীবনের প্রতিটি পর্বে পিতা মাতার পরিশ্রমের ফসল। শৈশবে মা যেমন সন্তানকে বুকের দুধ না খাইয়ে ঘুমাতে দেননি, বাবা যেমন নিজের চাহিদা ত্যাগ করে সন্তানকে পড়াশোনা করিয়েছেন, সেই ত্যাগের প্রতিদান কখনো সম্ভব নয়।

তাই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "তুমি বলো, হে আমার রব, তাদের প্রতি দয়া করো যেমন তারা শৈশবে আমাকে দয়া করে লালন-পালন করেছেন।" এই দোয়ার মাধ্যমে সন্তান যেন স্বীকার করে যে পিতা মাতার অনুগ্রহ অপরিমেয়।

বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা করা মানে তাদের ইচ্ছাকে মূল্য দেওয়া। তাদের যদি কোনো পছন্দের খাবার, পোশাক বা ধর্মীয় কাজ থাকে তাহলে তা সম্পন্ন করতে সহায়তা করা উচিত। কখনো কখনো তারা শুধু চায় কেউ তাদের পাশে বসুক, তাদের কথা শুনুক। সন্তান যদি ব্যস্ততার মাঝেও সময় দেয় তাহলে তারা মনে করেন তাদের জীবন এখনও অর্থবহ। এই অনুভূতি বৃদ্ধদের দীর্ঘজীবন দেয়, মানসিক শান্তি আনে।

বৃদ্ধ পিতা মাতার যত্ন নেওয়া আসলে সমাজের মানবিক চেতনার প্রতিফলন। যে সমাজে বৃদ্ধদের প্রতি সহানুভূতি থাকে সেই সমাজ নৈতিকভাবে উন্নত হয়। আর যেখানে বৃদ্ধরা অবহেলিত সেখানে মানুষ নিজেদের স্বার্থেই ব্যস্ত থাকে। তাই পরিবারের প্রতিটি সদস্যের উচিত বৃদ্ধদের প্রতি সচেতনতা সৃষ্টি করা। সন্তানদের শেখাতে হবে বৃদ্ধদের সেবা করা লজ্জার নয় বরং এটি সম্মানের বিষয়।

বৃদ্ধ বয়সের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো একাকিত্ব ও নিরাপত্তাহীনতা। অনেক পিতা মাতা আশঙ্কা করেন সন্তানরা একদিন হয়তো তাদের ত্যাগ করবে। এই ভয় দূর করা সন্তানের দায়িত্ব। তাদের নিশ্চয়তা দিতে হবে "আপনারা আমাদের বোঝা নন বরং আপনাদের জন্যই আমরা আছি।" এই বাক্যই তাদের জীবনে আশার আলো জ্বেলে দেয়।

বৃদ্ধ পিতা মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে সমাজে শান্তি, ভালোবাসা ও মানবিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়। সন্তান যদি পিতা মাতার সেবা করে সে নিজের সন্তানকেও শেখায় কিভাবে বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হয়। এভাবেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ভালোবাসার উত্তরাধিকার টিকে থাকে।

বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা একটি এমন দায়িত্ব যা সমাজে মানবিক বন্ধনকে দৃঢ় করে। আজকের প্রজন্ম যদি নিজেদের পিতা মাতার প্রতি যত্নবান হয় তাহলে ভবিষ্যতের সমাজ আরও দয়ালু, সহানুভূতিশীল ও ভারসাম্যপূর্ণ হবে। মানুষ তখন আর আত্মকেন্দ্রিক থাকবে না। পারিবারিক বন্ধনের গুরুত্ব বুঝবে। কারণ পরিবারই হলো সেই প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে ভালোবাসা, ধৈর্য ও ত্যাগের পাঠ শেখা হয়।

মানুষের জীবনের শেষ পর্যায়ে একাকিত্বের সঙ্গে লড়াই করা সবচেয়ে কঠিন। এই সময়টায় সন্তানদের উপস্থিতি এক ধরনের আশ্রয় হয়ে দাড়ায়। একটিমাত্র সান্ত্বনামূলক কথা, একটি হাসি, কিংবা এক কাপ চা ভাগাভাগি করে খাওয়ার মধ্যেও তারা অপরিসীম আনন্দ পান। এ আনন্দ কোনো সম্পদ বা সম্মানে মাপা যায় না। তাই সন্তানের উচিত এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে তাদের মা-বাবা নিশ্চিন্তে, শান্তিতে এবং মর্যাদার সঙ্গে বার্ধক্য কাটাতে পারেন।

অনেক সময় দেখা যায় পিতা মাতা সন্তানদের উপর রাগ করে কিছু বলে ফেলেন বা অভিমান করেন। সন্তানদের উচিত এসব কথাকে গুরুত্ব না দিয়ে ধৈর্য ধরতে শেখা। কারণ তারা এই বয়সে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। তাদের রাগ, অভিমান বা অযৌক্তিক প্রত্যাশার পেছনে আসলে ভালোবাসাই কাজ করে। সন্তান যদি তা বুঝতে পারে তাহলে সম্পর্ক কখনো ভেঙে যায় না।

একজন মুসলমানের জীবনে পিতা মাতার দোয়া সবচেয়ে বড় পুজি। এই দোয়া অনেক বিপদ থেকে রক্ষা করে। জীবনে বরকত আনে এবং আল্লাহর রহমতের দরজা খুলে দেয়। যারা বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা করে তারা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ পায়। তাদের জন্য জান্নাতের দরজা খুলে যায়। কারণ আল্লাহ নিজেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, “যে কৃতজ্ঞ, আমি তাকে আরও বেশি দেব।” পিতা মাতার সেবা করা আসলে কৃতজ্ঞতারই প্রকাশ।

আজকের সমাজে আধুনিকতার অজুহাতে অনেকেই মনে করেন বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা করা সময়ের অপচয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো এটি মানুষের চরিত্র গঠনের অন্যতম উপাদান। যে সন্তান তার পিতা মাতার প্রতি সহানুভূতিশীল সে সমাজেও ন্যায়পরায়ণ ও দায়িত্বশীল হয়। এই নৈতিক গুণই একটি জাতিকে উন্নতির পথে নিয়ে যায়। তাই বৃদ্ধদের প্রতি যত্ন ও শ্রদ্ধা আসলে সামাজিক উন্নয়নেরও একটি সূচক।

পিতা মাতার সেবার মাধ্যমে একজন মানুষ নিজের আত্মাকে শান্ত রাখে। কারণ আল্লাহর নির্দেশ পালন করে কেউ কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। যারা বৃদ্ধ মা-বাবাকে সম্মান করে তাদের জীবনে প্রশান্তি নেমে আসে। তারা পরিবারে সুখ ও ঐক্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করে। পিতা মাতার সন্তুষ্টিই তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্যের চাবিকাঠি।

বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা শুধু মানবিক নয়। এটি নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্বের সম্মিলন। পিতা মাতার প্রতি দয়া, নম্রতা, সম্মান ও ধৈর্য ধারণ করা একজন সন্তানের ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণ করে। তারা যখন এই দায়িত্ব পালন করে তখন সমাজে একটি আদর্শ তৈরি হয়। এই আদর্শই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নৈতিক ভিত্তি গড়ে দেয়।

বর্তমান সময়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম ও সামাজিক সংগঠনগুলোরও উচিত পিতা মাতার অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। স্কুল-কলেজে তরুণদের শেখানো উচিত কিভাবে বৃদ্ধদের সম্মান করতে হয়, তাদের প্রতি আচরণ কেমন হওয়া উচিত। পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত যদি এই মূল্যবোধ প্রচার করা যায় তাহলে বৃদ্ধদের প্রতি অবহেলা অনেকাংশে কমে যাবে।

বৃদ্ধ পিতা মাতার প্রতি অবহেলা সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। যারা নিজের মা-বাবার প্রতি দায়িত্বশীল নয়। তারা অন্যের প্রতিও সদয় হতে পারে না। ফলে সমাজ থেকে দয়া ও মমতা বিলীন হয়ে যায়। অপরদিকে যারা সেবা করে তাদের অন্তরে আল্লাহ মায়া, ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার গুণ দান করেন। এই গুণগুলোই মানুষকে প্রকৃত অর্থে মানবিক করে তোলে।

যে সন্তান বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা করে সে আসলে নিজের জীবনের প্রতিদান আদায় করছে। কারণ আজ সে যে ত্যাগ করছে, কাল তার সন্তানও তার জন্য তাই করবে। জীবন এক ধরনের প্রতিফলনের চক্র যা দেবে, তাই পাবে। তাই আজ যদি আমরা আমাদের পিতা মাতার সেবা করি ভবিষ্যতে আমাদের সন্তানরাও আমাদের সম্মান করবে। এই নীতিই পরিবারকে টিকিয়ে রাখে, সমাজকে স্থিতিশীল করে এবং মানবিক সম্পর্ককে দৃঢ় করে।

বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা করা মানে শুধু তাদের সঙ্গে থাকা নয় বরং তাদের অনুভূতি বোঝা। তারা অনেক সময় কিছু না বলেও অনেক কিছু প্রকাশ করেন। তাদের চোখে, নীরবতায়, মুখের রেখায় সন্তানের জন্য ভালোবাসা লুকিয়ে থাকে। এই ভালোবাসাকে মূল্য দিতে জানাই প্রকৃত কৃতজ্ঞতা। যখন সন্তান এই ভালোবাসা বুঝে ফেলে তখন তার মন থেকে স্বার্থপরতা দূর হয়ে যায়।

মানুষের জীবনে সফলতা শুধু অর্থ, পদ বা সম্মানে নয়। বরং পিতা মাতার সন্তুষ্টি অর্জনেই প্রকৃত সাফল্য নিহিত। কারণ তারা সন্তুষ্ট হলে আল্লাহও সন্তুষ্ট হন। যাদের মা-বাবা জীবিত আছেন তাদের জন্য এ সুযোগ এক অমূল্য নিয়ামত। আর যারা হারিয়ে ফেলেছেন তাদের উচিত দোয়ার মাধ্যমে তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করা, সৎ কাজ করে তাদের আত্মার শান্তির জন্য দোয়া করা

সবশেষে বলা যায়, বৃদ্ধ বয়সে পিতা মাতার সেবা শুধু একটি দায়িত্ব নয় এটি এক মহান ইবাদত।এক অনন্য সৌভাগ্য। যে ব্যক্তি এই দায়িত্ব ভালোবাসা ও ধৈর্যের সঙ্গে পালন করে সে আল্লাহর নিকট মর্যাদা লাভ করে। বৃদ্ধদের প্রতি দয়া ও সেবার মাধ্যমেই সমাজে প্রকৃত শান্তি, নৈতিকতা ও মানবিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

অবাধ্য সন্তানের দুনিয়া ও আখিরাতের শাস্তি

ইসলাম এমন এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। যেখানে পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্যকে ঈমানের অংশ বলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তার উপাসনা করতে এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন।
কোরআনে বারবার এসেছে,

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

“তোমার প্রভু নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা কেবল তারই ইবাদত করবে এবং পিতা-মাতার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করবে।”
(সূরা আল-ইসরা: ২৩)

অথাৎ ইসলামে পিতা-মাতার মর্যাদা এত উচ্চ যে আল্লাহ তায়ালা নিজ উপাসনার সঙ্গে তাদের প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। আবার এর বিপরীতে অবাধ্যতা, অবজ্ঞা বা কষ্ট দেওয়া এমন এক ভয়াবহ গুনাহ যার শাস্তি দুনিয়া ও আখিরাত দুই জগতেই অবাধ্য সন্তান পেয়ে থাকে ।

কোরআন ও হাদীসের আলোকে দেখা যায় অবাধ্য সন্তানের পরিণতি কখনও ভয়াবহ রোগ, অকাল মৃত্যু, রিযিকের সংকোচন বা মৃত্যুর সময় কষ্ট আকারে প্রকাশ পায়। অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার মাধ্যমে আমরা তা স্পষ্ট দেখতে পাই।

দুনিয়ায় শাস্তি

মানুষের জীবনে অনেক বিপদ, দুঃখ, অশান্তি, ব্যর্থতা ও রোগ-ব্যাধির মূল কারণ অনেক সময় নিজের গুনাহ। আর পিতা-মাতার অবাধ্যতা এমন এক গুনাহ যা দুনিয়াতেই দ্রুত শাস্তি এনে দেয়।

নবী করিম ﷺ বলেছেন,

كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الموت.

“সব গুনাহের শাস্তি আল্লাহ চাইলে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত বিলম্ব করতে পারেন। কিন্তু পিতা-মাতার অবাধ্যতার শাস্তি তিনি মৃত্যুর আগে দুনিয়াতেই দিয়ে থাকেন।”

(হাদীস: হাকেম, বায়হাকি)

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা অবাধ্য সন্তানের জন্য দুনিয়ায়ই অপমান, দারিদ্র্য, রোগ, অশান্তি ও ব্যর্থতা লিখে রাখেন।

সাহাবী যুগের সেই তরুণ যার জবান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল

এক সাহাবি যুগের ঘটনার কথা হাদীসে এসেছে।
এক ব্যক্তি মৃত্যুশয্যায় পড়ে রয়েছে। কিন্তু তার মুখ থেকে কালিমা বের হচ্ছে না। নবী করিম ﷺ জানতে চাইলেন, "এর কারণ কী?"
লোকজন বলল, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, সে নামাজ-রোজায় নিয়মিত ছিল, তবে তার মা তার ওপর রাগান্বিত।"

নবী ﷺ বললেন, "তার মাকে ডেকে আনো।"
মা এলে রাসুল ﷺ বললেন,
"তুমি যদি তোমার সন্তানের জন্য আগুনে পোড়ার আদেশ দাও, আমি তাই করব। তুমি কি ক্ষমা করবে, না আমি আগুনে জ্বালাব?"
মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন,
"ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি ক্ষমা করে দিলাম।"

মা ক্ষমা করতেই সাথে সাথে সেই সন্তানের মুখ থেকে উচ্চারিত হলো

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ

এবং সে ঈমানের সঙ্গে মৃত্যু বরণ করল।

এই ঘটনা প্রমাণ করে পিতা-মাতার রাগ ও অবাধ্যতা মৃত্যুর সময় ঈমানের বাক্য জবান থেকে বন্ধ করে দিতে পারে।

এক যুবকের অকাল মৃত্যুর ঘটনা

একটি গ্রামে এক যুবক বাস করত। সে দুনিয়ার দিক থেকে সুন্দর, বলবান ও সচ্ছল ছিল। কিন্তু তার চরিত্রে অহংকার প্রবল ছিল। বিশেষ করে নিজের পিতার প্রতি সে শ্রদ্ধা ও নম্রতার আচরণ করত না। পিতা যখন তাকে কোনো উপদেশ দিতেন বা কোনো কাজ থেকে বিরত থাকতে বলতেন, তখন সে উল্টো রাগ করত এবং তর্কে জড়িয়ে পড়ত। ধীরে ধীরে সে এমন পর্যায়ে পৌছে গেল যে, পিতার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। মা-বাবার ডাকে সাড়া না দিয়ে, গর্বভরে নিজের ইচ্ছেমতো চলতে শুরু করে।

একদিন সকালে সে তার ঘোড়ায় চড়ে গ্রামের বাইরে বেড়াতে বের হয়। সেদিনও পিতা তাকে নিষেধ করেছিলেন বাবা, আজ বাইরে যেও না। মনটা অশান্ত লাগছে।কিন্তু যুবক রাগ করে পিতাকে উত্তর দিল, আপনি সবসময় ভয় দেখান। আমি নিজের মতো চলব। তারপর সে রাগান্বিত মুখে ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল।

কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ ঘোড়াটি অস্থির হয়ে উঠে দাড়াল। যুবক ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল মাটিতে। ঘোড়ার পায়ের নিচে পড়ে তার মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে এবং মুহূর্তের মধ্যেই তার মৃত্যু ঘটে।

এই দুর্ঘটনার খবর গ্রামে পৌছালে সবাই স্তব্ধ হয়ে যায়। মানুষ ছুটে আসে মৃতদেহ দেখতে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যুবকের মুখ বিকৃত হয়ে গিয়েছিল।তার রঙ কালো হয়ে গিয়েছিল এবং তার দেহ থেকে তীব্র দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল। গ্রামের আলেম ও বয়োজ্যেষ্ঠরা বলেন, এই যুবক তার পিতা-মাতার অবাধ্য ছিল, তাদের প্রতি অহংকারী আচরণ করত। আল্লাহ তায়ালা তাকে দুনিয়াতেই সতর্কবার্তা হিসেবে শাস্তি দিয়েছেন, যেন অন্যরা শিক্ষা নেয়।

যখন তার কবর খোড়া হচ্ছিল, তখনো সেই দুর্গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। লোকেরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে, অনেকেই কাদতে থাকে। কেউ কেউ বলল, দুনিয়ায় আল্লাহর কুদরত দেখুন! যে ব্যক্তি পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্য হয় তার পরিণতি কত ভয়াবহ হয়।

এরপর গ্রামের আলেম মসজিদে খুতবা দিলেন,

হে মুসলমানরা! এই ঘটনা তোমাদের জন্য শিক্ষা। পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া কোনো ছোট গুনাহ নয়। আল্লাহ তায়ালা কোরআনে ইরশাদ করেছেন

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

‘তোমার প্রভু আদেশ করেছেন—তোমরা কেবল তারই ইবাদত করো এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করো।’

(সূরা আল-ইসরাঃ ২৩)

যে ব্যক্তি পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়, তার দোয়া কবুল হয় না, তার রিজিক সংকুচিত হয়ে যায়। আর সে মৃত্যুর সময়ও শান্তি পায় না।

এই ঘটনার পর গ্রামের অনেক যুবক তাদের পিতা-মাতার কাছে ক্ষমা চাইতে আসে। তারা কাদতে কাদতে বলে, আমরা আর কখনো এমন করব না।

আলেমরা বললেন, এটাই আল্লাহর রহমতএকজনের মৃত্যুর মাধ্যমে অনেকের হৃদয় নরম হয়ে যায়।

এই ঘটনাটি আজও গ্রামের মানুষ স্মরণ করে শিক্ষা নেয়। তারা তাদের সন্তানদের বারবার বলে, বাবা-মার অবাধ্য হয়ো না। যে দুনিয়ায় পিতা-মাতার অবাধ্য হয় তার পরিণতি শুধু আখিরাতে নয় দুনিয়াতেও ভয়াবহ হয়।

এইভাবে এক অহংকারী যুবকের অকাল মৃত্যু হয়ে গেল। কিন্তু তার ঘটনা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য হয়ে রইল তওবা ও সতর্কতার উপদেশস্বরূপ।

সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা এর সময়কার এক হৃদয়স্পর্শী ঘটনা

একবার এক ব্যক্তি প্রচণ্ড কষ্টে, অশান্তিতে ও হতাশায় ভুগতে ভুগতে সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর দরবারে উপস্থিত হলো। তার মুখে দুঃখের ছাপ, চোখে অশ্রু, কণ্ঠে ক্লান্তি। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন,

হে আবদুল্লাহ ইবনে উমর! আমার জীবনে কোনো শান্তি নেই। ব্যবসায় ক্ষতি, ঘরে অশান্তি, সন্তানরা অবাধ্য, মন সর্বদা অস্থির থাকে। আমি নামাজ পড়ি, দোয়া করি, কিন্তু যেন কোনো কাজেই বরকত হচ্ছে না।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) গভীরভাবে তার কথা শুনলেন। কিছুক্ষণ চুপ থেকে জিজ্ঞেস করলেন,
তুমি কি তোমার মাকে কখনো কষ্ট দিয়েছো?

লোকটি মাথা নিচু করে বলল, হ্যা, একবার রাগের মাথায় আমি আমার মাকে কটু কথা বলেছিলাম। এমনকি তাকে অপমানও করেছিলাম। পরে লজ্জায় আর তার সামনে যাইনি।

এই কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর চোখে অশ্রু চলে এলো। তিনি বললেন,
হে মানুষ! তুমি কি জানো না, মায়ের দোয়া হলো জান্নাতের চাবি।আর মায়ের অভিশাপ হলো দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বনাশ!
যে ব্যক্তি মাকে কষ্ট দেয় তার রিজিকে বরকত থাকে না।তার হৃদয়ে শান্তি আসে না।আল্লাহ তার দোয়া কবুল করেন না।
তুমি এখনই ফিরে গিয়ে তোমার মায়ের কাছে ক্ষমা চাও। তার পায়ের নিচে মুখ রাখো এবং বলো, মা আমি ভুল করেছি।
যদি তোমার মা তোমাকে মাফ করে দোয়া দেন, আল্লাহ নিশ্চয় তোমার ভাগ্য উল্টে দেবেন।

লোকটি কাঁদতে কাঁদতে বলল, হে আবদুল্লাহ, আমি কি সত্যিই ক্ষমা পেতে পারি?
ইবনে উমর (রা.) বললেন, আল্লাহর রহমত অসীম। মা যদি খুশি হন তবে আল্লাহও খুশি হন।

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঘরে ফিরে গেল। দরজার বাইরে দাড়িয়ে সে দেখল, তার বৃদ্ধা মা চৌকাঠে বসে সুতার কাজ করছেন। মায়ের মুখে ক্লান্তি কিন্তু চোখে মমতা।

ছেলেটি চুপচাপ এগিয়ে এসে মায়ের পা জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল। বললো,মা আমি অন্যায় করেছি। আমি তোমার প্রতি গর্ব দেখিয়েছি, তোমাকে কষ্ট দিয়েছি। মা, আমাকে ক্ষমা করে দাও!

মা প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেলেন, তারপর ছেলের মাথায় হাত রেখে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, বাবা, আমি তো অনেক আগেই তোমাকে মাফ করে দিয়েছি। তুমি আমার সন্তান, তোমার কষ্ট আমার কষ্ট। আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন, শান্তি দিন।

সেই মুহূর্তে যেন এক শান্তির স্রোত তার হৃদয়ে নেমে এলো। মা দু'হাত তুলে দোয়া করলেন "হে আল্লাহ, আমার সন্তানের জীবনে সুখ ও শান্তি দান করুন। তার রিজিকে বরকত দিন, তার গোনাহ মাফ করুন।"

আল্লাহর কুদরত দেখ!
কয়েকদিনের মধ্যেই লোকটির ব্যবসা ঘুরে দাড়াল, ঘরে শান্তি ফিরল, মন প্রশান্ত হলো। সে প্রতিদিন মায়ের খেদমত করত, তার জন্য দোয়া চাইত।
গ্রামের মানুষ অবাক হয়ে দেখল যে মানুষ একসময় হতাশ ও দুর্ভাগার প্রতীক ছিল। সে এখন সুখী, সফল ও পরহেজগার হয়ে গেছে।

যখন আবার সে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর কাছে গেল, তখন তার মুখে আনন্দের ঝলক। বলল,
হে আল্লাহর রাসুলের সাহাবি! আপনি যা বলেছেন, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে। আমার মা আমাকে ক্ষমা করেছেন, আর আল্লাহ আমার ভাগ্য বদলে দিয়েছেন।

ইবনে উমর (রা.) আল্লাহর প্রশংসা করে বললেন,
হে মানুষ, মনে রেখো

رِضَا اللهِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ، وَسَخَطُ اللهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ

আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত আছে পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আর আল্লাহর রোষ নিহিত আছে পিতা-মাতার রোষে।
(তিরমিজি)

এই ঘটনা শুধু সেই ব্যক্তির জীবনই বদলে দেয়নি বরং অসংখ্য মানুষের হৃদয়ে শিক্ষা জাগিয়েছে যে পিতা-মাতার দোয়া অর্জন করে তার জন্য দুনিয়াও জান্নাত হয়ে যায়।
আর যে তাদের কষ্ট দেয় তার জীবনে শান্তি হারিয়ে যায়।

এইভাবেই এক মায়ের ক্ষমা ও দোয়ার বরকতে একজন হতাশ মানুষ নতুন জীবন ফিরে পেল।এবং প্রমাণ হয়ে গেল মায়ের দোয়া হলো আল্লাহর রহমতের দরজা।যা খুললে বরকত ও সুখের স্রোত নেমে আসে।

মৃত্যুর সময়ের কষ্ট

ইমাম যাহাবি (রহ.) এর বর্ণিত ঘটনাঃ

ইমাম যাহাবি (রহ.) তার "কাবিরা গুনাহ" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে এক ভীতিকর ঘটনার উল্লেখ করেছেন।
এক ব্যক্তি মৃত্যুশয্যায় ছিল। মৃত্যুর সময় তার মুখ বিকৃত হয়ে যাচ্ছিল, শরীর কাঁপছিল আর সে প্রচণ্ড যন্ত্রণায় চিৎকার করছিল।

আশপাশের লোকেরা তাকে কালিমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পড়াতে চাইল কিন্তু সে মুখ ফিরিয়ে নিল। তারা বারবার চেষ্টা করল। তবুও তার মুখে কালিমা এল না।

এ সময় তার মা বললেন,

এই সন্তান ছোটবেলা থেকেই আমার অবাধ্য ছিল, আমাকে কষ্ট দিত, অপমান করত। আমি তার জন্য আল্লাহর কাছে বিচার দেব।

লোকেরা অনুরোধ করল, হে মা! আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন।
কিন্তু মা বললেন,

আমি আল্লাহর কাছে বিচার দেব। সে আমার হৃদয় ভেঙে দিয়েছে।

তারপর সেই লোকটি তীব্র যন্ত্রণায় মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু মুখে একবারও কালিমা উচ্চারিত হয়নি।

এমন মৃত্যু আলেমরা বলেন "সু'উল খাতিমা" (মন্দ পরিণতি) অর্থাৎ ঈমানের আলো নিয়ে মৃত্যুবরণ না করা।এবং এর মূল কারণ ছিল তার মা-বাবার প্রতি অন্যায় আচরণ ও অবাধ্যতা।

কেন মৃত্যুর সময় এমন কষ্ট হয়?

ইসলামি ব্যাখ্যানুযায়ী, মৃত্যুর সময় মানুষ আল্লাহর রহমত বা গজবের প্রতিফল দেখতে পায়।

যে ব্যক্তি পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয় তার জন্য আল্লাহর রহমত বন্ধ হয়ে যায়। মায়ের দোয়া যেমন জান্নাতের দরজা খুলে দেয় তেমনি মায়ের অভিশাপ সেই দরজাই বন্ধ করে দেয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"পিতামাতার সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টি, আর তাদের অসন্তুষ্টি আল্লাহর অসন্তুষ্টি।"

(তিরমিজি)

অতএব যে সন্তান তার পিতা-মাতাকে অসন্তুষ্ট করে সে আসলে আল্লাহকেই অসন্তুষ্ট করে। মৃত্যুর মুহূর্তে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে সে তীব্র কষ্টে নিঃশেষ হয়ে যায়।

আরেকটি ঘটনা

একজন যুবক মৃত্যুশয্যায় ছিল। তার মুখে কালিমা আসছিল না। লোকজন তার পিতা-মাতাকে খুজে আনল।

মা কেঁদে বললেন,

সে জীবনে আমাকে একবারও 'মা' বলে ডাকে নি। সব সময় আমাকে অবজ্ঞা করেছে।

যখন মাকে ক্ষমা করতে বলা হলো তখন মা তাকে ক্ষমা করে দিলেন।
মাত্র কয়েক মুহূর্ত পর যুবকটির মুখে কালিমা উচ্চারিত হলো এবং সে শান্তভাবে মৃত্যুবরণ করল।

এ থেকেই বোঝা যায়, পিতামাতার দোয়া বা অভিশাপ মৃত্যুর সময়ের পরিণতি নির্ধারণ করে।

আল্লাহর সতর্কবাণী

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

“তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন, তাকে ছাড়া আর কাউকে ইবাদত করো না, এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো। তাদের কেউ যদি বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদের ‘উফ’ বলো না এবং ধমক দিয়ো না। বরং তাদের সঙ্গে নম্রভাবে কথা বলো।”
(সূরা বনি ইসরাইল: ২৩)

এই আয়াত স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, সামান্য অবাধ্যতা, এমনকি “উফ” শব্দ উচ্চারণ করাও আল্লাহর ক্রোধ ডেকে আনে।
যে ব্যক্তি পিতা-মাতার প্রতি এমন আচরণ করে, তার মৃত্যু সহজ হয় না বরং তার আত্মা কষ্টের মধ্য দিয়ে দেহ থেকে বের হয়।

আলেমদের মতামত

ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেন,

“যে ব্যক্তি পিতা-মাতার অবাধ্য, তার মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা তার আত্মা কঠিনভাবে বের করে নেয়, যেমন কাঁটা গাছ থেকে কাপড় টেনে বের করলে ছিড়ে যায়।”

ইমাম গাজ্জালি (রহ.) বলেন,

“যে সন্তান পিতা-মাতার অবাধ্য হয় তার মৃত্যু হয় অপমানজনকভাবে। তার মুখ বিকৃত হয়ে যায়।দেহ ভারী হয়ে পড়ে এবং আল্লাহ তার অন্তর অন্ধ করে দেন।”

দুনিয়ার জীবনে শাস্তি ও আখিরাতের ভয়াবহতা

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

“দুনিয়াতেই যে গুনাহর শাস্তি দ্রুত দেওয়া হয়, তার মধ্যে অন্যতম হলো পিতা-মাতার অবাধ্যতা।”
(হাকিম)

অর্থাৎ এই গুনাহের শাস্তি শুধু আখিরাতে নয় দুনিয়াতেও আসে।

১.জীবনে অশান্তি

২.রিজিকে বরকতহীনতা

৩. দুঃখ-কষ্ট, রোগ-ব্যাধি

৪. এবং মৃত্যুর সময় ভয়ংকর যন্ত্রণা।

কবরের শাস্তি

ইমাম বায়হাকি (রহ.) বলেন,

“কবরের আজাবের অন্যতম কারণ হচ্ছে পিতা-মাতার অবাধ্যতা।”

(শু‘আবুল ইমান, ইমাম বায়হাকি)

এই উক্তি শুধু একটি বর্ণনা নয়। এটি গভীর এক বাস্তবতার ইঙ্গিত। পিতা-মাতা মানব জীবনের প্রথম শিক্ষক।দুনিয়ার সর্বাধিক হকদার। তাদের প্রতি অবাধ্যতা শুধু দুনিয়ার অশান্তি নয় বরং মৃত্যুর পরও ভয়াবহ শাস্তির কারণ হয়ে দাড়ায়।

কবরের আজাব কী?

কবরের আজাব হলো এমন এক শাস্তি যা মৃত্যুর পর কিন্তু কিয়ামতের আগে শুরু হয়। এটি “বারযাখ জীবনের” অংশ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

"আগুনের সামনে তারা সকাল-সন্ধ্যা উপস্থাপিত হয়। কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার দিন বলা হবে— ফেরাউন পরিবারের লোকদের প্রবল শাস্তিতে প্রবেশ করাও।"
(সূরা গাফির: ৪৬)

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে কিয়ামতের আগে মানুষ কবরের জীবনে কিছু শাস্তি বা নিয়ামতের সম্মুখীন হয়।

পিতা-মাতার অবাধ্যতা এমন এক গুনাহ যা আল্লাহ তায়ালা খুব দ্রুত শাস্তি দেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

“দুনিয়াতে এমন দুটি গুনাহ আছে যার শাস্তি আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতেই দেন। পাশাপাশি আখিরাতে তার শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। তা হলো জুলুম ও পিতা-মাতার অবাধ্যতা।”
(হাকিম, সহীহুল জামে: ২৯০৭)

অর্থাৎ যে সন্তান মা-বাবাকে কষ্ট দেয় সে মৃত্যুর আগে কিংবা কবরের জীবনে অবশ্যই এর ফল ভোগ করবে।

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগের ঘটনা

একজন তরুণ মৃত্যুবরণ করল। লোকেরা জানাজা শেষ করে নবী করিম ﷺ কে জানালেন।

রাসুল ﷺ বললেন,

"এই তরুণ কবরের ভেতর দোয়া চাইছে।কিন্তু তার মুখ থেকে দোয়া বের হচ্ছে না। কারণ সে জীবিত অবস্থায় তার মাকে কষ্ট দিয়েছিল।"

(ইমাম বায়হাকি, শু'আবুল ইমান)

এই ঘটনাটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে, মায়ের কষ্ট দেওয়া শুধু দুনিয়ার অশান্তি নয়।মৃত্যুর পরও তা আত্মার উপর ভয়ংকর প্রভাব ফেলে। তার জিহ্বা থেমে গেছে, দোয়া করার শক্তিও কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

কবরের আযাবের প্রকৃতি

হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় কবরের আজাব নানাভাবে হয়।

১.কবর চাপ দিয়ে আত্মাকে কষ্ট দেয়।

২. অন্ধকার ও ভয়ংকর দৃশ্য দ্বারা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়,

৩.ফেরেশতারা কঠিন প্রশ্ন করেন,

৪.কেউ কেউ আগুন বা বিষাক্ত প্রাণীতে আক্রান্ত হয়।

ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেন,

"যে ব্যক্তি আল্লাহর হক ও বান্দার হক নষ্ট করে তার কবর অন্ধকার হয়ে যায়। সে সেখানে চিৎকার করে কিন্তু কেউ তাকে শুনতে পায় না।"

কবরের আজাব থেকে বাঁচার উপায়

১. পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা।
তাদের জন্য নিয়মিত দোয়া করা, দান-সদকা করা, মৃত্যুর পরও তাদের জন্য ইস্তিগফার করা।

২. নামাজ ও তাকওয়া অবলম্বন করা।রাসুল ﷺ বলেন, "নামাজ কবরের অন্ধকার দূর করে।"

৩. কবরের আজাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া।

নবী ﷺ প্রতিটি নামাজের শেষ রাকাআতে দোয়া করতেন,

"اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر"

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কবরের আজাব থেকে আশ্রয় চাই।"

৪. মানুষের হক আদায় করা ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা।

আখিরাতের শাস্তি

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও শ্রদ্ধা ইসলামে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে আল্লাহ তায়ালা তাওহিদের পরপরই তা উল্লেখ করেছেন। কোরআনে বলা হয়েছে,

“তুমি আমার সঙ্গে কাউকে শরিক করো না; আর পিতা-মাতার সঙ্গে উত্তম আচরণ করো।” (সূরা নিসা: ৩৬)

অর্থাৎ, পিতা-মাতার আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্যেরই এক অংশ। যে তাদের কষ্ট দেয়, সে আসলে আল্লাহরই অসন্তুষ্টি অর্জন করে। তাই আখিরাতে পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তানের জন্য অপেক্ষা করছে ভয়াবহ পরিণতি।যাকে কোরআন ও হাদীসে বিভিন্নভাবে চিত্রিত করা হয়েছে।

কেয়ামতের দিন অবাধ্য সন্তানের অবস্থা

কিয়ামতের দিন যখন মানুষ তার হিসাবের জন্য উপস্থিত হবে।তখন অবাধ্য সন্তানদের মুখে থাকবে কালিমার চিহ্ন। ফেরেশতারা তাদের চিনবে এভাবে
“এরা সেইসব লোক, যারা দুনিয়ায় পিতা-মাতাকে কষ্ট দিয়েছে।”

ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেন,

“যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয় আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার মুখে ‘عاق لوالديه’ (পিতা-মাতার অবাধ্য) লিখে দেবেন। সে লোকদের মধ্যে সবচেয়ে লাঞ্ছিত হবে।”

(তাফসিরে কুরতুবি, সূরা লুকমান ব্যাখ্যা)

এমন মানুষকে আল্লাহ তায়ালা তিনটি বড় শাস্তি দেবেন।

১। আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না।
২।তার হিসাব সহজ করবেন না।
৩।তার মুখে অবাধ্যতার চিহ্ন থাকবে। যাতে সবাই তাকে চিনে লজ্জা দেয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

তিনজন মানুষ জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।

১) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান,
২) নারী-পুরুষ যারা ব্যভিচার করে,
৩) মিথ্যাবাদী নেতা।

(সহিহ বুখারি)

এই হাদীস থেকে বোঝা যায় অবাধ্য সন্তান শুধু জান্নাত থেকে বঞ্চিতই হবে না।বরং জান্নাতের সুবাসও পাবে না।যার সুবাস ৫০০ বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়। (সহিহ হাদীস)
তাফসিরে কুরতুবিতে বর্ণিত হয়েছে,

কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে ডাকা হবে। তার সামনে থাকবে পাহাড়সম নেক আমল।নামাজ, রোজা, দান-সদকা, কুরআন তেলাওয়াত সবই থাকবে।
কিন্তু আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের আদেশ দেবেন,
“এই আমলগুলো মুছে দাও। কারণ সে তার পিতা-মাতাকে কষ্ট দিয়েছিল।”

লোকটি বিস্মিত হয়ে বলবে, “হে আল্লাহ! আমার এত নেকি কোথায় গেল?”
তখন বলা হবে,

“তুমি তোমার মাকে কাঁদিয়েছিলে, বাবাকে অপমান করেছিলে।এই অশ্রু আর দোয়ার অভাব তোমার সব আমল ধ্বংস করে দিয়েছে।”

ফলে তার সব সওয়াব বাতিল হয়ে যাবে। তাকে লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামের পথে ঠেলে দেওয়া হবে।

(তাফসিরে কুরতুবি, সূরা লুকমান আয়াত ১৪ ব্যাখ্যা)

আখিরাতে শাস্তির ধরন

অবাধ্য সন্তানের জন্য আখিরাতে যে শাস্তিগুলো নির্ধারিত তা বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়।

১.হিসাব কঠিন হবে। ফেরেশতারা তার প্রতিটি গুনাহ বিশদভাবে তুলে ধরবে।

২. আমল নামা অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকবে। কারণ সে মা-বাবার দোয়া থেকে বঞ্চিত ছিল।

৩.পিতা-মাতার হক আদায় না করার কারণে সে পুলসিরাত সেতু পার হতে পারবে না।

৪.জাহান্নামে নিচু স্তরে নিক্ষিপ্ত হবে।

রাসুল ﷺ বলেন, “অবাধ্য সন্তান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।”

(বায়হাকি, শু‘আবুল ইমান)

পিতা-মাতার দোয়া সন্তানের জন্য জান্নাতের পথ তৈরি করে। আর তাদের বদদোয়া জাহান্নামের পথ খুলে দেয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

"তিনটি দোয়া আল্লাহ প্রত্যাখ্যান করেন না। নবীর দোয়া, মুসাফিরের দোয়া, ও পিতা-মাতার দোয়া।"
(তিরমিজি)

অর্থাৎ যদি পিতা-মাতা সন্তানের জন্য দোয়া করেন, সে সফল হয়।আর যদি কষ্ট পেয়ে বদদোয়া করেন, আল্লাহ তায়ালা সেটি দ্রুত কবুল করেন।

অবাধ্য সন্তানের রিজিক সংকোচন

ইমাম ইবনে জাওযি (রহ.) বলেন,

"যে ব্যক্তি তার মাকে কষ্ট দেয় আল্লাহ তায়ালা তার রিযিক সংকুচিত করে দেন তার জীবনে সুখ ও প্রশান্তি থাকে না।"

এই কথাটি শুধুমাত্র কোনো উপদেশ নয় বাস্তব জীবনের এক কঠিন বাস্তবতা। পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্যতা এমন একটি গুনাহ যার ফল মানুষ এই দুনিয়াতেই দেখতে পায়। আল্লাহ তায়ালা কখনো কখনো দুনিয়াতেই শাস্তি দেন, যাতে মানুষ অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসে।

অবাধ্যতার ফলে রিযিক সংকুচিত হয়।

রিযিক কেবল অর্থ বা সম্পদ নয়। রিযিকের মধ্যে শান্তি, স্বাস্থ্য, পরিবারে মিল-মোহাব্বত, মনোবল, সম্মান সবই অন্তর্ভুক্ত। যখন কেউ মাকে বা বাবাকে কষ্ট দেয় তখন আল্লাহ তায়ালা তার রিযিকের বারাকাহ উঠিয়ে নেন।

ফলে দেখা যায় অনেক পরিশ্রম করেও আয় স্থায়ী হয় না।অর্থ এলেও কোথায় চলে যায় বোঝা যায় না।ঘরে অশান্তি ও মানসিক অস্থিরতা নেমে আসে।সন্তান অসুস্থ থাকে বা জীবনে দুর্ভাগ্য ঘন ঘন আসে।

বাস্তব ঘটনা থেকে আমাদের জন্য শিক্ষা

একজন তরুণ নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছিলেন।

"আমি বহু বছর ধরে চেষ্টা করেও সফল হতে পারিনি। চাকরি পাই না। ব্যবসা টেকে না।মনেও শান্তি নেই।
একজন আলেম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কখনো মাকে কষ্ট দিয়েছ?
সে চুপ করে গেল। পরে স্বীকার করল সে অনেক সময় মায়ের সাথে রূঢ় আচরণ করেছে।
আলেম বললেন, তুমি এখনই মায়ের কাছে ক্ষমা চাও।
তরুণটি আন্তরিকভাবে মায়ের কাছে ক্ষমা চায়, মায়ের পা ধরে কাঁদে।
অল্প সময়ের মধ্যেই তার জীবনে পরিবর্তন আসে। চাকরি মিলে যায়, মন শান্ত হয়, রিযিকের পথ খুলে যায়।"

এই ঘটনাটি শুধু একটি উদাহরণ নয়।হাজারো মানুষের জীবনে এমন পরিবর্তন দেখা গেছে। যখন তারা পিতা-মাতার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করেছে।

মায়ের দোয়া হলো সন্তানের ভাগ্যের আলো। আর মায়ের কষ্ট হলো জীবনের অন্ধকার।
যে মা একসময় সন্তানকে কোলে নিয়ে ঘুম পাড়াতেন, তার সেই বুকের ব্যথা যদি সন্তানের আচরণে জাগে, তখন আল্লাহর রহমতও দূরে সরে যায়।

নবী করিম ﷺ বলেছেন,

"পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি, আর তাদের অসন্তুষ্টিতেই আল্লাহর অসন্তুষ্টি।"
(তিরমিজি, হাদিস: ১৮৯৯)

তাই যদি কেউ অতীতে পিতা-মাতার কষ্টের কারণ হয়ে থাকে তাহলে এখনই তওবা করা উচিত।

আন্তরিকভাবে তাদের কাছে মাফ চাওয়া,তাদের জন্য দোয়া করা,তাদের যত্ন নেওয়া ও খুশি রাখার চেষ্টা করা।
এসব কাজের মাধ্যমে আল্লাহর রহমত আবার ফিরে আসে।

অবাধ্য সন্তানের জীবনে রিযিকের সংকোচন ও দুঃখ কোনো কাকতাল নয়। এটি আল্লাহর ন্যায়বিচারের একটি রূপ। মায়ের কষ্টে সুখ হারিয়ে যায়।কিন্তু মায়ের সন্তুষ্টিতেই রিযিকের দরজা খুলে যায়।

"যে ব্যক্তি তার মাকে খুশি রাখে, তার জীবনে আল্লাহ তায়ালা এমন বরকত দেন, যা সে কখনো কল্পনাও করতে পারে না।"

তাই আমাদের উচিত প্রতিদিন পিতা-মাতার খুশির দিকে লক্ষ্য রাখা। কারণ তাদের সন্তুষ্টিই দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার চাবিকাঠি।

অবাধ্য সন্তানের মৃত্যুর সময় জাহান্নামের আগুনের ঝলক

একদিন আল্লাহর রাসুল ﷺ এক জানাজায় অংশগ্রহণ করলেন।
যখন মৃত ব্যক্তিকে কাফনে মোড়ানো হলো তখন নবী ﷺ হঠাৎ লক্ষ্য করলেন মৃত ব্যক্তির মুখমণ্ডল অস্বাভাবিকভাবে কালো হয়ে গেছে।

নবী ﷺ আশেপাশের সাহাবাদের জিজ্ঞাসা করলেন,

"তোমরা কি জানো, এই ব্যক্তির চেহারা কালো হয়ে গেছে কেন?"

সাহাবারা বিনীতভাবে বললেন,

"আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন।"

নবী ﷺ তখন বললেন,

"এই ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় তার পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্য ছিল।
মৃত্যুর সময় আল্লাহ তায়ালা তাকে জাহান্নামের আগুনের ঝলক দেখিয়েছেন।

সেই আগুনের ভয় ও তাপেই তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে গেছে।"

(তাফসিরে ইবনে কাসির, সূরা আহকাফের তাফসিরে বর্ণিত)

পিতামাতার আনুগত্যের মর্যাদা

অবাধ্য সন্তানের জন্য যেমন দুনিয়া ও আখিরাতে ভয়াবহ শাস্তি নির্ধারিত আছে। তেমনি বাধ্য, অনুগত ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারকারী সন্তানের জন্য রয়েছে অসীম পুরস্কার ও রহমত।যে সন্তান পিতা-মাতার আদেশ মানে, তাদের প্রতি বিনয়ী থাকে, তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে আল্লাহ তায়ালা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মান দান করেন।

কোরআনে আল্লাহ বলেন,

"আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছি।"
(সূরা আল-আহক্বাফ ৪৬:১৫)

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি, আর পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে রয়েছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।"
(তিরমিজি)

অতএব যে সন্তান পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট রাখে সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকেই সন্তুষ্ট রাখে।সে দুনিয়াতে তার জীবনে বরকত, রিযিকের প্রশস্ততা ও মানুষের ভালোবাসা পায়।
আর আখিরাতে আল্লাহ তাকে জান্নাতের মর্যাদাপূর্ণ স্থানে অধিষ্ঠিত করবেন।

যে সন্তান মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে চায়, পিতার কষ্টে সান্ত্বনা দেয়, সে প্রকৃত মুমিন। আল্লাহ এমন সন্তানের প্রতি বিশেষ রহমত বর্ষণ করেন।

ইমাম ইবনে জাওযি (রহ.) বলেন,

"যে ব্যক্তি পিতা-মাতাকে খুশি করে, আল্লাহ তার রিযিকে বরকত দান করেন, তার জীবনে শান্তি দেন।"

যে সন্তান মায়ের দোয়া লাভ করে তার জন্য রহমতের দরজা খুলে যায়। ব্যবসা-বাণিজ্যে সাফল্য আসে, জীবনে সুখ-শান্তি ও সম্মান বৃদ্ধি পায়।

আবার যে সন্তান পিতা-মাতাকে সম্মান করে আল্লাহ তার মৃত্যুকে সহজ করে দেন। ফেরেশতারা তার কাছে শান্তির বার্তা নিয়ে আসে এবং মৃত্যুর পর কবরেও সে শান্তিতে থাকে।

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের অবাধ্য আচরণে সমাজে এর নেতিবাচক প্রভাব

পিতা-মাতা মানবজীবনের সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগুরু। সন্তান তাদের কোলে জন্ম নেয়। তাদের ত্যাগ ও পরিশ্রমে তারা বড় হয়।জীবনের প্রতিটি ধাপে তাদের দিকনির্দেশনা ও আশীর্বাদে সফলতা অর্জন করে। কিন্তু যখন সন্তান পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্য হয় তখন শুধু তার ব্যক্তিগত জীবন নয় গোটা সমাজও নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত হয়। এই অবাধ্য আচরণ সমাজে এক ধরনের অশান্তি, অস্থিরতা ও অবিশ্বাস সৃষ্টি করে।

পারিবারিক কাঠামো ভেঙে পড়ে

পরিবার হলো সমাজের মূল ভিত্তি। একেকটি পরিবারই সমাজের একটি ক্ষুদ্র ইউনিট। যদি সন্তান পিতা-মাতার অবাধ্য হয় তবে সেই পরিবারের ভালোবাসা, সম্মান ও পারস্পরিক বন্ধন ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়।
যখন পরিবারের ভিতরে সম্মান ও শৃঙ্খলা হারিয়ে যায় তখন সমাজে নৈতিকতার আলোও নিভে যায়।
অবাধ্য সন্তান পরিবারে অন্য ভাইবোনদের জন্যও খারাপ উদাহরণ সৃষ্টি করে। ফলে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যেও অবমাননার সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ে।

এটি পুরো পরিবারকে ভেঙে দেওয়ার মতো একটি ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি।

অবাধ্য সন্তান পিতা-মাতার কথাকে তুচ্ছ মনে করে, তাদের নির্দেশনা উপেক্ষা করে। এতে তাদের মনে গভীর আঘাত লাগে। ধীরে ধীরে ভালোবাসার জায়গায় অভিমান ও কষ্ট জায়গা নেয়। ঘরে অশান্তি সৃষ্টি হয়, সম্পর্কের উষ্ণতা নষ্ট হয়ে যায়। পিতা-মাতা যদি দোয়া করা বন্ধ করে দেন সেই সন্তানের জীবনে বরকতও কমে যায়। কারণ পিতা-মাতার দোয়া আল্লাহর রহমত পাওয়ার অন্যতম মাধ্যম।

একজন অবাধ্য সন্তানের আচরণ শুধু পিতা-মাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। তার প্রভাব পড়ে পুরো পরিবারের ওপর। ভাই-বোনেরা যখন দেখে বড় ভাই বা বোন পিতা-মাতাকে অসম্মান করছে, তারাও ধীরে ধীরে সেই পথেই চলে যায়। ফলে পরিবারের মধ্যে শৃঙ্খলা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা হারিয়ে যায়। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিভেদ, ঝগড়া, মনোমালিন্য বাড়তে থাকে। একসময় এমনও হয় যে পিতা-মাতা একা হয়ে যান।তাদের পাশে কেউ থাকে না।

অবাধ্যতা নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটায়। পিতা-মাতা হচ্ছেন সন্তানের প্রথম শিক্ষক।পিতা-মাতার প্রতি সম্মান দেখানো একটি সমাজের নৈতিকতার মাপকাঠি। যেখানে সন্তান পিতা-মাতাকে অবহেলা করে সেখানে শিক্ষক, প্রবীণ, ও সমাজের অন্যান্য সম্মানীয় ব্যক্তিদের প্রতিও সম্মান বিলুপ্ত হয়ে যায়।যে সমাজে ছোটরা বড়দের মানে না সেখানে শৃঙ্খলা ও ন্যায়বোধ টিকে থাকতে পারে না।
অবাধ্য সন্তান একসময় সমাজের আইনকেও তুচ্ছ করে। যার ফলে অপরাধ, দুর্নীতি ও অবিচার বৃদ্ধি পায়। এমন সন্তান সমাজে অবাধ্য, জেদি ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। এতে সমাজের মধ্যেও শৃঙ্খলা নষ্ট হয়।কারণ পরিবারই সমাজের প্রথম শিক্ষালয়।

ইসলাম পিতা-মাতার প্রতি আনুগত্যকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে।

কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

“তুমি আল্লাহর ইবাদত কর এবং তার সঙ্গে কাউকে শরিক করো না। আর পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার কর।” (সূরা নিসা: ৩৬)

নবী করিম ﷺ বলেছেন,

“আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত আছে পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে, আর আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত আছে পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে।” (তিরমিজি)

অতএব পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্যতা শুধু পারিবারিক সমস্যা নয়।এটি আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণও। এমন সন্তান দুনিয়াতে শান্তি পায় না।জীবনে অশান্তি নেমে আসে এবং আখিরাতে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হয়।

অন্যদিকে যে সন্তান পিতা-মাতার প্রতি বাধ্য ও শ্রদ্ধাশীল সে পরিবারের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। তার দোয়ার বরকতে পরিবারে শান্তি নেমে আসে, রিযিক বৃদ্ধি পায়। সমাজেও সে সম্মান পায়।

তাই বলা যায় যেখানে পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নেই সেখানে পারিবারিক কাঠামো কখনোই স্থায়ী হতে পারে না। অবাধ্যতার আগুন ধীরে ধীরে সেই ঘরের ভালোবাসা, ঐক্য ও সুখকে পুড়িয়ে ফেলে। তাই প্রতিটি সন্তানের কর্তব্য হলো পিতা-মাতার প্রতি বিনয়ী, বাধ্য ও কৃতজ্ঞ থাকা। কারণ পিতা-মাতাই পরিবারের শান্তি ও কল্যাণের মূল ভিত্তি।

এক সময় সন্তানদের জন্য পিতা-মাতাই ছিল অনুপ্রেরণার প্রতীক। কিন্তু আজকের অবাধ্য প্রজন্মে দেখা যায় তারা তাদের আদর্শ হিসেবে চায় সেলিব্রিটি, ফ্যাশন আইকন বা টিকটক তারকাদের।
ফলে সমাজে প্রকৃত দিকনির্দেশনার সংকট সৃষ্টি হয়।

যে সমাজে বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান নেই সেখানে নেতৃত্বের যোগ্য ব্যক্তিও তৈরি হয় না।এভাবে সমাজ নেতৃত্বহীন ও দিকহীন হয়ে পড়ে।

অবাধ্যতা শুধু এক প্রজন্মেই সীমাবদ্ধ থাকে না।এটি চেইনের মতো এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়ে।
যে সন্তান তার পিতা-মাতার অবাধ্য হয় তার সন্তানও ভবিষ্যতে তার প্রতি একই আচরণ করে।
ফলে সমাজে প্রজন্মের মধ্যে ঘৃণা, অবিশ্বাস ও সম্পর্কহীনতা জন্ম নেয়।
একসময় সমাজে এমন এক প্রজন্ম তৈরি হয় যারা কোনো মূল্যবোধে বিশ্বাস করে না।

ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয় পিতা-মাতার দোয়া সন্তানদের জন্য রহমত।যে সমাজে পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তানরা বেড়ে যায় সে সমাজ থেকে আল্লাহর রহমত ধীরে ধীরে সরে যায়।
অভিশপ্ত সন্তানেরা যখন সংখ্যায় বেড়ে যায় তখন সমাজে অকালমৃত্যু, দারিদ্র্য, রোগ, বৃষ্টি-অভাবসহ নানা বিপর্যয় দেখা দেয়।
এভাবে অবাধ্যতা শুধু পারিবারিক নয় সমাজব্যাপী শাস্তির কারণ হয়।

অর্থাৎ পিতা-মাতার অবাধ্যতা সমাজে এক নীরব বিষের মতো ছড়িয়ে পড়ে। এটি শুধু পারিবারিক বন্ধন নষ্ট করে না বরং নৈতিকতা, মানবিকতা, ও ঈমানের আলো নিভিয়ে দেয়।
যে সমাজে পিতা-মাতার সম্মান রক্ষা করা হয় সেখানে আল্লাহর বরকত থাকে, শান্তি থাকে, উন্নতি থাকে।
অতএব সমাজকে রক্ষা করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য ফিরিয়ে আনা।
এটি শুধু একটি ধর্মীয় কর্তব্যই নয় বরং সভ্য সমাজ গঠনের মৌলিক শর্ত।

আধুনিক যুগে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের অবহেলার কারন বিশ্লেষণ

আধুনিক যুগে পিতামাতার প্রতি সন্তানের অবহেলা একটি বড় সমস্যা। এটি অনেক কারণে ঘটে। পরিবর্তিত জীবনধারা প্রযুক্তি শিক্ষা সামাজিক মানসিকতা এবং পারিবারিক কাঠামোর পরিবর্তন এর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আজকাল অনেক সন্তান তাদের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত চাহিদাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। তারা পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব কম মনে করে।

প্রযুক্তি ব্যবহার এই সমস্যাকে আরও বাড়িয়েছে। স্মার্টফোন ইন্টারনেট এবং সামাজিক মাধ্যম সন্তানদের ভার্চুয়াল জগতে বেশি সময় দেয়। পরিবারে আসল সংযোগের সময় কমে যায়। সন্তানরা অনলাইন বন্ধুদের সঙ্গে বেশি সম্পর্ক রাখে। এতে তারা পিতামাতার প্রয়োজন কম অনুভব করে।

শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষাগত চাপও একটি কারণ। পরীক্ষা প্রতিযোগিতা এবং ক্যারিয়ারের জন্য চাপ সন্তানদের মানসিকভাবে ব্যস্ত রাখে। তারা পরিবারের মূল্যবোধের প্রতি মনোযোগ দেয় না। বাবা-মায়ের পরামর্শ এবং নির্দেশনা অনেক সময় তারা অগ্রাহ্য করে। তারা স্বাধীনতা এবং আত্মনির্ভরতার জন্য পরিবারের নিয়ম উপেক্ষা করে।

সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনও এ সমস্যায় ভূমিকা রাখে। আধুনিক সমাজে স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত চাহিদা বেশি গুরুত্ব পায়। পরিবারের প্রতি দায়িত্ব কমে যায়। বিশেষ করে নগরাঞ্চলে পরিবারিক সমন্বয় কম থাকে। বাবা-মায়ের সহায়তা কম থাকলে সন্তানরা আত্মকেন্দ্রিক হয়।

আর্থিক চাপও সমস্যা বাড়ায়। বাবা-মায়ের কর্মব্যস্ততা একাধিক চাকরি এবং দৈনন্দিন ব্যয় সন্তানের জন্য মনোযোগ কমায়। সন্তানরা তাদের নিজস্ব চাহিদার প্রতি বেশি মনোযোগ দেয়। এতে তারা পিতামাতার আবশ্যকতা কম বুঝতে পারে।

পরিবারিক কাঠামোর পরিবর্তনও প্রভাব ফেলে। একক পরিবার বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ অথবা অভিভাবকের অনুপস্থিতি সন্তানকে প্রায়শই অবাধ্য করে তোলে। অতিরিক্ত কঠোর নিয়মও বিদ্রোহ তৈরি করে।

বিনোদন মাধ্যম যেমন টেলিভিশন সিনেমা এবং গেমস সন্তানদের মানসিক ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রভাবিত করে। সহিংসতা উপভোগবাদ এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি আকর্ষণ তাদের পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা কমায়।

মানসিক অবস্থা এবং মানসিক স্বাস্থ্যও প্রভাব ফেলে। মানসিক চাপ হতাশা এবং অভ্যন্তরীণ অসন্তুষ্টি সন্তানদের আচরণে প্রভাব ফেলে। তারা প্রায়শই পিতামাতার প্রতি অবজ্ঞা দেখায়।

পিতামাতার আচরণ এবং উদাসীনতাও একটি কারণ। যদি বাবা-মা সন্তানের প্রতি সময় দেয় না বা পর্যাপ্ত স্নেহ দেখায় না, সন্তানরা বিদ্রোহী হয়। তারা পরামর্শ এবং নির্দেশনা তুচ্ছ মনে করে।

ধর্মীয় এবং নৈতিক শিক্ষা এবং মূল্যবোধের অভাবও প্রভাব ফেলে। সন্তানরা যদি ছোটবেলা থেকে শ্রদ্ধা এবং দায়িত্ব শিখতে না পারে তারা বড় হয়ে পিতামাতার প্রতি অবহেলা করতে পারে।

পারিবারিক বন্ধনের অভাবও সমস্যা বাড়ায়। পরিবারের সদস্যরা একে অপরের সঙ্গে সময় কাটায় না। প্রকৃত অনুভূতি শেয়ার করা হয় না। সন্তানরা পরিবারকে কম মূল্যায়ন করতে শুরু করে। বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের অভাব পিতামাতার প্রতি অবহেলার প্রবণতা বাড়ায়।

পিতামাতার প্রতি সন্তানের অবহেলা একাধিক কারণে ঘটে। অর্থনৈতিক সামাজিক প্রযুক্তিগত মানসিক নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সব দিক প্রভাব ফেলে। আধুনিক জীবনধারা নগরায়ণ শিক্ষাগত চাপ প্রযুক্তির আধিপত্য এবং পারিবারিক সমন্বয়হীনতা সব মিলিয়ে এটি বাড়ায়।

সমাধান সম্ভব। পিতামাতা এবং সন্তানদের সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য সচেতন প্রচেষ্টা দরকার। পিতামাতাকে সন্তানদের সঙ্গে সময় কাটাতে হবে। তাদের কথা শোনার এবং বোঝার মানসিকতা রাখতে হবে। পরিবারিক শিক্ষা নৈতিক এবং ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে সন্তানদের মানসিক ও নৈতিক মূল্যবোধ গঠন করা যেতে পারে। সন্তানদের প্রযুক্তি ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা এবং ভার্চুয়াল জগতের প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

পিতামাতার প্রতি অবহেলা সমাজের জন্যও সমস্যা। এতে শুধু পরিবার নয় সমাজও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ববোধ এবং সম্মান রাখা মানে সমাজের নৈতিক ভিত্তি রক্ষা করা। আধুনিক যুগে পরিবারিক সচেতনতা সংলাপ এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা বিকাশ অপরিহার্য। সন্তানদের শিক্ষাদান মানসিক সমর্থন এবং দিকনির্দেশনা এই প্রবণতা কমাতে সাহায্য করে।

আধুনিক যুগে পিতামাতার প্রতি সন্তানের অবহেলার কারণ বোঝা বিশ্লেষণ করা এবং সমাধানের পথ বের করা সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটি কেবল ব্যক্তিগত সমস্যা নয়।

পরিবারিক সম্পর্ক সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং নৈতিক মূল্যবোধের উপর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলে।

পশ্চিমা সমাজ বনাম ইসলামি সমাজে পারিবারিক মূল্যবোধের পার্থক্য

পশ্চিমা সমাজে পরিবারকে প্রায়শই একটি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্র চেতনার অংশ হিসেবে দেখা হয়। এখানে সন্তানরা ছোটবেলা থেকেই নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে তুলতে শেখে এবং তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেওয়া হয়। পিতামাতা ও সন্তানদের সম্পর্ক প্রায়শই বন্ধুত্বের রূপে থাকে এবং শৃঙ্খলা বা বাধ্যবাধকতা তুলনামূলকভাবে কম। সন্তানের প্রতি দায়িত্ব বোধ থাকলেও তা ব্যক্তিগত সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং পারিবারিক সিদ্ধান্তগুলো প্রায়শই ব্যক্তিগত পছন্দ ও আর্থিক স্বনির্ভরতার উপর নির্ভর করে। এছাড়া পশ্চিমা সমাজে বিবাহ, সন্তান পালন এবং পরিবার সম্প্রসারণের ধারা অনেক সময় ব্যক্তির পছন্দের ওপর ভিত্তি করে এবং সামাজিক চাপ তুলনামূলকভাবে কম থাকে।

অপরদিকে ইসলামি সমাজে পরিবারকে আল্লাহর দেয়া একটি সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সংস্থা হিসেবে গণ্য করা হয়। এখানে সন্তানরা ছোটবেলা থেকেই পিতামাতার প্রতি সম্মান ও আস্থা শিখে এবং পরিবারে আদর্শ শৃঙ্খলা মেনে চলার শিক্ষা দেয়া হয়। পিতামাতার সাথে সম্পর্ক প্রায়শই কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের ভিত্তিতে স্থাপিত হয় এবং সন্তানদের আচরণ, শিক্ষার প্রতি মনোযোগ ও পারিবারিক সম্মান বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারকে সমাজের মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয় এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হলেও তা পরিবারের নৈতিক ও সামাজিক সীমার মধ্যে থাকে। বিবাহ, সন্তান পালন ও পারিবারিক দায়িত্ব ইসলামের বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং সমাজের সমষ্টিগত মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ থাকে।

পশ্চিমা সমাজে পারিবারিক বন্ধন প্রায়শই সম্পর্কের মানসিক ও সামাজিক সুবিধার উপর নির্ভর করে। যেখানে ইসলামি সমাজে তা একটি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক কর্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এখানে সন্তানদের শৃঙ্খলাবোধ, পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং পরিবারের সম্মান প্রধান মূল্যবোধ হিসেবে বিবেচিত হয়। পশ্চিমা সমাজে পারিবারিক দায়িত্ব ব্যক্তিগত সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও ইসলামি সমাজে তা জীবনব্যাপী এবং পিতামাতার সুখ ও সন্তুষ্টির দিকে সর্বোচ্চ মনোযোগ দেয়া হয়।

পশ্চিমা সমাজে পরিবারকে স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে দেখা হয়। যেখানে সন্তানরা নিজের পছন্দ অনুযায়ী জীবন গড়ে তোলে। ইসলামি সমাজে পরিবারকে

একটি নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে দেখা হয়, যেখানে সন্তানরা পিতামাতার নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন যাপন করে এবং পরিবারকে শক্তিশালী রাখে। পশ্চিমা সমাজে পারিবারিক সম্পর্ক প্রায়শই সমানাধিকারের ভিত্তিতে চলে, যেখানে ইসলামি সমাজে সম্পর্ক অভ্যন্তরীণ কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের ভারসাম্যের ওপর ভিত্তি করে।

পশ্চিমা সমাজে সামাজিক মূল্যবোধ ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করা হয়, যেখানে ইসলামি সমাজে ধর্মীয় ও পারিবারিক নৈতিকতার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়। পশ্চিমা সমাজে সন্তানরা প্রায়শই স্বতন্ত্রভাবে সমাজে স্থাপন হয়, যেখানে ইসলামি সমাজে সন্তানদের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক দায়িত্বের সঙ্গে পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। পারিবারিক বন্ধন ও সম্মান ইসলামি সমাজে সামাজিক স্থিতি ও নৈতিকতার প্রতীক হিসেবে গণ্য হয়, যেখানে পশ্চিমা সমাজে তা ব্যক্তিগত সুখ ও সম্পর্কের মানসিক ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল।

পশ্চিমা সমাজে পিতামাতার দায়িত্ব প্রায়শই শিশুদের আর্থিক ও শিক্ষাগত সহায়তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ইসলামি সমাজে পিতামাতার দায়িত্ব শিশুদের নৈতিক শিক্ষা, সামাজিক আচরণ, ধর্মীয় শিক্ষা ও পারিবারিক সম্মান বজায় রাখার মধ্যে বিস্তৃত। পশ্চিমা সমাজে সন্তানদের স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্র পরিচয় বজায় রাখা মূল লক্ষ্য, যেখানে ইসলামি সমাজে সন্তানদের শৃঙ্খলা, কর্তব্য ও পরিবারে অবদান রাখা প্রধান লক্ষ্য।

পশ্চিমা সমাজে পরিবারের মধ্যে সমস্যার সমাধান প্রায়শই ব্যক্তিগত সমঝোতা ও আইনগত ব্যবস্থা দ্বারা করা হয়। ইসলামি সমাজে পরিবারকে আল্লাহর নিয়ম ও ধর্মীয় নির্দেশনার আলোকে পরিচালনা করা হয় এবং পারিবারিক সম্পর্ককে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে দেখা হয়। পশ্চিমা সমাজে সন্তানরা প্রায়শই পিতামাতার সাথে সমানভাবে বন্ধুত্ব করে, ইসলামি সমাজে পিতামাতার প্রতি সন্তানের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য সর্বোচ্চ গুরুত্ব পায়।

পশ্চিমা সমাজে পারিবারিক বন্ধন প্রায়শই মানসিক সহায়তা, আর্থিক সমর্থন ও সম্পর্কের সুবিধার উপর নির্ভর করে, ইসলামি সমাজে এটি আধ্যাত্মিক দায়িত্ব, নৈতিক কর্তব্য এবং সামাজিক সম্মানের প্রতীক। পশ্চিমা সমাজে সন্তানের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও পছন্দকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়, ইসলামি সমাজে পরিবার ও ধর্মীয় নৈতিকতার সীমার মধ্যে স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ থাকে।

পশ্চিমা সমাজে পারিবারিক সম্পর্কের ধরণ অনেক সময় পরিবর্তনশীল, সন্তানরা বড় হলে নিজের পথে চলে যায়। ইসলামি সমাজে পরিবারকে জীবনের সর্বদা স্থায়ী দায়িত্ব হিসেবে গণ্য

করা হয়, সন্তানদের শৃঙ্খলা ও পিতামাতার সম্মান জীবনের শেষ পর্যন্ত পালন করতে হয়। এছাড়াও পশ্চিমা সমাজে পরিবারের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব প্রায় সমানভাবে বিতরণ করা হয়, ইসলামি সমাজে পিতামাতার কর্তৃত্ব ও সন্তানদের আনুগত্যের মধ্যে ভারসাম্য রাখা হয়।

পশ্চিমা সমাজে বিবাহ ও সন্তান পালন ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র পছন্দের উপর নির্ভরশীল, ইসলামি সমাজে তা ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয়। পশ্চিমা সমাজে পারিবারিক মূল্যবোধ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সম্পর্কের মানসিক ভিত্তি ও আর্থিক সক্ষমতার সাথে যুক্ত, ইসলামি সমাজে তা আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা ও সামাজিক দায়িত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত।

ইসলামি দৃষ্টিতে এর সমাধান ও দিকনির্দেশনা

পিতামাতার প্রতি সন্তানের অবাধ্যতা আজকের আধুনিক সমাজে একটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। এটি শুধু পরিবারের অভ্যন্তরীণ সমস্যা নয় বরং সন্তানের নিজস্ব জীবন এবং সমাজের ওপরও দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ইসলামী শিক্ষায় পিতামাতার প্রতি সন্তানের সম্মান এবং আজ্ঞাবহতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোরআন ও হাদিসে বারবার এই বিষয়টি গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করা হয়েছে।

সন্তানের অবাধ্যতা পরিবারের মানসিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা নষ্ট করে। পিতামাতা সন্তানের জন্য সুখ, নিরাপত্তা এবং সাফল্যের আশা রাখেন। কিন্তু সন্তান যদি তাদের পরামর্শ, আদেশ এবং নির্দেশনা উপেক্ষা করে তখন পরিবারের মধ্যে মানসিক চাপ এবং হতাশা বৃদ্ধি পায়। শিশু যখন ঘরে অবাধ্য আচরণ করে তখন পিতামাতার হৃদয়ে দুঃখ এবং হতাশা জন্মায়। পরিবারে সংঘাত, বিরোধ এবং অশান্তি বৃদ্ধি পায় যা দীর্ঘমেয়াদে পারিবারিক বন্ধন দুর্বল করে। অবাধ্য সন্তানের কারণে ঘরে শান্তি থাকে না, পরিবারের অভ্যন্তরে উত্তেজনা ও অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে।

সন্তানের নিজের জীবনের দিক থেকেও অবাধ্যতা গুরুতর প্রভাব ফেলে। ইসলামি শিক্ষায় পিতামাতার সন্তুষ্টি অর্জনকে জীবনের বরকত এবং আল্লাহর রহমতের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে ধরা হয়। পিতামাতার প্রতি অবাধ্য আচরণ এই বরকতকে বাধাগ্রস্ত করে। ফলে সন্তান পরিশ্রম করে হলেও তার রিজিকে বাধা আসে, জীবনে সুখ ও শান্তির অভাব দেখা দেয়। এছাড়াও অবাধ্য সন্তানের জীবনে সমস্যা, দুঃখ এবং অসুবিধা স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পায়। ইসলামিক ঐতিহ্যে অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে অবাধ্য সন্তান জীবনে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, তাদের রিজিক সংকুচিত হয়েছে এবং তাদের জীবন অশান্তিতে ভরা ছিল।

সমাজের ওপরও অবাধ্য সন্তানের নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যখন শিশু ও কিশোররা দেখেন যে বড়রা পিতামাতার প্রতি অবাধ্য, তখন তারা এটাকে স্বাভাবিক আচরণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। এর ফলে সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে। অসভ্য আচরণ, দায়িত্বহীনতা, অশালীনতা এবং নৈতিক অবনতি বৃদ্ধি পায়। যুব সমাজে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, সামাজিক বন্ধন দুর্বল হয় এবং সম্মান ও নৈতিকতার অবমূল্যায়ন ঘটে। একটি অবাধ্য সন্তান সমাজে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। যা পরবর্তী প্রজন্মের চরিত্র গঠনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এই সমস্যার সমাধান মূলত তিনটি স্তরে করা সম্ভব। পরিবারিক শিক্ষা, নৈতিক উদাহরণ এবং প্রার্থনা ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন।

প্রথমত পরিবারকে সন্তানের সাথে ধৈর্য্যসহকারে আচরণ করতে হবে। কোরআন ও হাদিসে বারবার ধৈর্যের গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। সন্তানকে শাসন করার সময় ক্রোধ বা কঠোরতা নয়।বরং নরম এবং সমঝদার শিক্ষার মাধ্যমে তাকে সঠিক পথে পরিচালনা করা উচিত। পিতামাতার কর্তব্য হলো সন্তানের নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা নিশ্চিত করা। নামাজ, রোজা, সদাচরণ, সততা, ভদ্রতা এবং দায়িত্ববোধ শেখানো প্রয়োজন। পিতামাতা তাদের নিজের আচরণে উদাহরণ স্থাপন করলে সন্তানও তা অনুসরণ করে।

দ্বিতীয়ত,নৈতিক উদাহরণ স্থাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশু এবং কিশোররা বড়দের আচরণ দেখেই শেখে। যদি পিতামাতা পরস্পরের প্রতি সম্মান দেখান, নৈতিক ও ধার্মিক আচরণ করুন এবং সন্তানের প্রতি ধৈর্য প্রদর্শন করেন।তাহলে সন্তানও তা অনুসরণ করবে। সংসারে ইতিবাচক পরিবেশ বজায় রাখলে, সন্তানের মধ্যে ভালো চরিত্র ও শৃঙ্খলা গড়ে ওঠে।

তৃতীয়ত, প্রার্থনা ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন অপরিহার্য। পিতামাতা নিয়মিত আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলে এবং সন্তানের জন্য সৎ ও নৈতিক জীবন কামনা করলে আল্লাহ তায়ালা তাদের সহায়তা করবেন। ইসলামিক ঐতিহ্যে বহু উদাহরণ রয়েছে যেখানে পিতামাতার দোয়া সন্তানের জীবন পরিবর্তন করেছে।

শাস্তির ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষায় জোর বা কঠোর শাস্তি দেওয়ার চেয়ে সমঝদার ও নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব বেশি। সন্তানকে বুঝিয়ে শেখানো, তার মনোবৃত্তি পরিবর্তন করা এবং ইতিবাচক আচরণের জন্য উৎসাহ দেওয়া বেশি কার্যকর। পরিবারে ইতিবাচক পরিবেশ, প্রণোদনা এবং নৈতিক শিক্ষা সমন্বয় করে অবাধ্যতার প্রবণতা অনেকাংশে কমানো সম্ভব।

উপসংহারে, সন্তানের অবাধ্যতা মোকাবেলায় ইসলামী দৃষ্টিকোণ হলো ধৈর্য, উদাহরণ স্থাপন, নৈতিক শিক্ষা, প্রার্থনা এবং ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি। এটি কেবল সন্তানের চরিত্র গড়ে তোলে না একই সাথে পরিবার ও সমাজকে সুস্থ, শান্তিপূর্ণ এবং নৈতিকভাবে শক্তিশালী রাখে। পিতামাতার কষ্ট হ্রাস পায়, সন্তানের জীবনে বরকত বৃদ্ধি পায় এবং সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ হয়।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দিকনির্দেশনা

ভবিষ্যতের প্রজন্মের জন্য সন্তানের পিতামাতার প্রতি আচার-আচরণ ও মূল্যবোধ নিয়ে দিকনির্দেশনা ইসলামী শিক্ষার আলোকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি কেবল বর্তমান সমাজকে সুস্থ রাখে না সেই সাথে আগামী প্রজন্মের চরিত্র, মনোভাব এবং নৈতিক মান উন্নয়নের জন্য ভিত্তি স্থাপন করে।

প্রথমত, শিশুদের ছোটবেলা থেকেই নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে গড়ে তোলা আবশ্যক। পিতামাতার কর্তব্য হলো তাদের সন্তানকে নামাজ, রোজা, সদাচরণ, সততা এবং ভদ্রতার শিক্ষায় পরিচিত করা। ছোটবেলা থেকেই যদি শিশু অনুগত, ধৈর্যশীল এবং শ্রদ্ধাশীল আচরণের অভ্যাস গড়ে তোলে, তাহলে তার ভবিষ্যত জীবন সুস্থ ও বরকতময় হয়। ইসলামে পিতামাতার প্রতি সন্তানের আজ্ঞাবহতা একটি মহত্ত্বপূর্ণ আদর্শ হিসেবে বিবেচিত। কোরআন ও হাদিসে এ বিষয়ে নির্দেশনার গুরুত্ব বারবার উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সন্তানদের জন্য পরিবারের মধ্যে একটি ইতিবাচক ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি করা আবশ্যক। বাবা-মা নিজেদের আচরণে উদাহরণ স্থাপন করলে, সন্তানও তা অনুসরণ করে। সংসারে সম্মান, ভালবাসা, ধৈর্য এবং আন্তরিকতা বজায় রাখলে শিশুদের মধ্যে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ উন্নত হয়। শিশুরা বড়দের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে, তাই পিতামাতার সতর্কতা ও সদাচরণ ভবিষ্যতের প্রজন্মকে সঠিক পথে পরিচালনা করে।

তৃতীয়ত, প্রজন্মকে শিক্ষিত ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ধৈর্য ও প্রার্থনার গুরুত্ব অপরিসীম। পিতামাতা নিয়মিত প্রার্থনার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সন্তানের নৈতিক উন্নতি এবং সঠিক পথচলা কামনা করতে পারেন। পাশাপাশি শিশুদের মধ্যে সহমর্মিতা, সাহায্যপ্রবণতা এবং মানবিক গুণাবলীর বিকাশ নিশ্চিত করা উচিত। এই মানসিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণ তাদের সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম করে।

চতুর্থত, শিশুর মধ্যে প্রযুক্তি, সামাজিক মাধ্যম এবং আধুনিক বিশ্বের প্রভাবকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। আজকের প্রজন্মের সন্তানরা বহুলাংশে ডিজিটাল মিডিয়ার সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং পিতামাতাকে তাদের সন্তানদের জন্য সীমাবদ্ধতা ও দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করতে হবে। যেন তারা অবাধ্যতা, অশালীনতা এবং অসৎ আচরণ থেকে দূরে থাকে।

পঞ্চমত, শিশুদের জন্য নিয়মিত শিক্ষা ও জীবন দক্ষতা শেখানো দরকার। কেবল বইয়ের জ্ঞান নয়, বাস্তব জীবনের নৈতিকতা, সামাজিক শৃঙ্খলা এবং পারস্পরিক সম্মান শেখানো প্রয়োজন। এটি তাদের আত্মবিশ্বাস এবং সঠিক মনোবৃত্তি গঠনে সহায়ক হয়।

এছাড়া সন্তানদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সম্মান বজায় রাখার শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের অভ্যন্তরে এবং বন্ধুপরিবেশে তারা কিভাবে আচরণ করবে, কিভাবে বিরোধ মীমাংসা করবে এবং কিভাবে দায়িত্বশীল নাগরিক হবে এসব বিষয়ে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেওয়া আবশ্যক।

সর্বশেষে, ভবিষ্যতের প্রজন্মকে গড়ে তোলার মূল ভিত্তি হলো পিতামাতার দৃষ্টান্ত, নৈতিক শিক্ষা, ধৈর্য, প্রার্থনা এবং ইতিবাচক পরিবেশ। যদি শিশুদের ছোটবেলা থেকেই এই মূল্যবোধে পরিচিত করা যায়, তাহলে তারা বড় হয়ে একটি নৈতিক, দায়িত্বশীল এবং সম্মানজনক জীবন যাপন করবে। তারা কেবল নিজেদের জীবনকে সফল ও বরকতময় করবে না, সেই সাথে পরিবার, সমাজ এবং সম্প্রদায়েরও উন্নতি ও শান্তি নিশ্চিত করবে।

উপসংহার

পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব এমন এক বিষয় যা শুধু পারিবারিক নয় বরং সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের গভীরতম স্তরকে স্পর্শ করে। মানুষ পৃথিবীতে আসার পর যে দুইজনের মাধ্যমে জীবনের আলো দেখতে পায় তাদের প্রতি দায়িত্ববোধই প্রকৃত মানবতার ভিত্তি। পিতা মাতা সন্তানের জীবনে এমন এক ছায়া যারা নিজের সুখ ত্যাগ করে সন্তানের কল্যাণে নিবেদিত থাকেন। তাই সন্তানের কর্তব্য হলো তাদের প্রতি শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসার আচরণ প্রদর্শন করা। সময়ের পরিবর্তনে সমাজ যত আধুনিক হচ্ছে ততই এ দায়িত্ববোধ অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে পড়ছে। অথচ ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব পালন করা নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাতের পর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

একজন মানুষ যত বড়ই হোক যত জ্ঞানী বা ধনী হোক না কেন সে কখনোই পিতা মাতার ঋণ শোধ করতে পারে না। কারণ তারা শুধু জন্মই দেননি তারা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সন্তানের সুখের জন্য নিজের ঘুম, শান্তি, সময় সব কিছু ত্যাগ করেছেন। সন্তানের দায়িত্ব তাই শুধু তাদের ভরণপোষণ নয় সেই সাথে তাদের মানসিক সান্ত্বনা, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাদের পাশে থাকা। বিশেষ করে বার্ধক্যে যখন তারা দুর্বল ও অসহায় হয়ে পড়েন তখনই সন্তানের প্রকৃত দায়িত্বের পরীক্ষা হয়।

আজকের যুগে দেখা যায় অনেক সন্তান কর্মব্যস্ততার অজুহাতে পিতা মাতার প্রতি অবহেলা করে। কেউ কেউ আবার তাদের বৃদ্ধাশ্রমে রেখে নিজের জীবনের আনন্দে ডুবে থাকে। এটি শুধু নৈতিক অবক্ষয় নয় আল্লাহর আজাবের ভয়াবহ কারণ। ইসলাম পিতা মাতার অধিকারকে এতটাই গুরুত্ব দিয়েছে যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন “মা’কে তিনবার এবং বাবা’কে একবার অধিক হকদার মনে করো।” এই হাদীস থেকেই স্পষ্ট হয় যে পিতা মাতার যত্ন নেওয়া ও তাদের দোয়া অর্জন করা সন্তানের জন্য জান্নাতের অন্যতম পথ।

একজন সন্তান যদি পিতা মাতার সাথে সুন্দর আচরণ করে তাদের প্রয়োজন বুঝে সেবা করে। তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে তবে সে শুধু পার্থিব শান্তিই পায় না, আখিরাতে আল্লাহর রহমতের অধিকারী হয়। অপরদিকে যে সন্তান তাদের অবহেলা করে, তাদের কষ্ট দেয়, রূঢ় ভাষায় কথা বলে, সে নিজের জীবন থেকে বরকত হারায়। তার রিজিকে সংকীর্ণতা আসে, মনে অশান্তি নেমে আসে। তাই ইসলামী সমাজে পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব শুধু সামাজিক সম্পর্ক নয় এটি ইমানেরও অংশ।

পিতা মাতার সেবা করার অনেক রূপ আছে। কখনও এটি হতে পারে তাদের মুখে হাসি ফোটানো, কখনও তাদের জন্য সামান্য পানি এগিয়ে দেওয়া, আবার কখনও অসুস্থ অবস্থায় তাদের পাশে থেকে দোয়া করা। এসব ছোট ছোট কাজই একদিন সন্তানের জীবনে অশেষ কল্যাণ বয়ে আনে।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন,

তাদের সাথে উফ বলো না, তাদের ধমক দিও না। বরং সম্মানসূচক কথা বলো।
এ আয়াতের মাধ্যমে বুঝা যায়, ইসলাম পিতা মাতার প্রতি কোমলতা ও বিনয়ের কত উচ্চ মর্যাদা দিয়েছে।

সন্তানের উচিত শুধু দুনিয়াবি দায়িত্ব নয় আখিরাতের সফলতার দিক থেকেও তাদের জন্য দোয়া করা। মৃত পিতা মাতার জন্য দোয়া করা, তাদের নামে সাদকায়ে জারিয়া করা, তাদের শোকর আদায় করা এগুলোও সন্তানের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। একজন নেক সন্তান যখন তার পিতা মাতার জন্য দোয়া করে তখন কবরের অন্ধকারেও আল্লাহ তায়ালা সেই দোয়ার বরকতে আলো দান করেন। তাই সন্তানের দায়িত্ব শুধু জীবিত অবস্থায় নয় মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকে।

বর্তমান সমাজে প্রযুক্তি ও বস্তুবাদের প্রভাবে পারিবারিক বন্ধন অনেকটাই দুর্বল হয়ে গেছে। কিন্তু যেসব পরিবারে সন্তানরা এখনো পিতা মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সেসব পরিবারেই প্রকৃত শান্তি বিরাজ করে। তাই সমাজে নৈতিকতা ও মানবিকতা ফিরিয়ে আনতে হলে সন্তানের মধ্যে পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। এটি হবে একটি নৈতিক বিপ্লব যা সমাজকে আবার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার বন্ধনে আবদ্ধ করবে।

যে সন্তান তার পিতা মাতাকে সম্মান করে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মান নির্ধারণ করেন। সে যেমন নিজের জীবনে শান্তি লাভ করে তেমনি ভবিষ্যতে তার সন্তানরাও তার প্রতি অনুগত হয়। এটি আল্লাহর একটি ন্যায়বিচার। যেমন করো তেমনই ফল ভোগ করো। তাই প্রত্যেক সন্তানের উচিত নিজের আচরণের মাধ্যমে এমন উদাহরণ স্থাপন করা যাতে আগামী প্রজন্মও পিতা মাতার মর্যাদা বুঝতে শেখে।

একজন সন্তানের জীবনে পিতা মাতার সেবা শুধু কর্তব্য নয়।এটি আত্মার প্রশান্তি। যতদিন তারা জীবিত থাকেন ততদিন তাদের পাশে থেকে সেবা করা একটি বরকতময় সুযোগ। একবার তারা চলে গেলে আর ফিরে পাওয়া যায় না। তখন শুধু অনুশোচনা আর দুঃখই থেকে

যায়। তাই জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তাদের সাথে মমতাময় আচরণ করা, তাদের মুখে হাসি ফোটানো, তাদের দোয়া অর্জন করা এটাই প্রকৃত সফলতা।

সন্তানের জন্য পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব পালন মানে শুধু দৈহিক সেবা নয়।মানসিক ও আবেগগত সহমর্মিতাও অন্তর্ভুক্ত। বয়সের সাথে সাথে পিতা মাতার শারীরিক ও মানসিক শক্তি কমে আসে। তখন সন্তানকে তাদের পাশে থাকা, কথায় মনোযোগ দেওয়া, তাদের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করা এবং কখনও কখনও কেবল পাশে বসে তাদের সঙ্গে সময় কাটানোও দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। এসব কাজ সন্তানের জন্য এক ধরনের ধৈর্য, সহনশীলতা এবং ভালোবাসার পরীক্ষা। যারা এই দায়িত্বকে গম্ভীরভাবে নেয় তারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর রহমত ভোগ করে।

পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব পালনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ধৈর্য্য। কখনও কখনও বৃদ্ধা পিতা মা অসহজ আচরণ করতে পারেন, কথা বলার ধরনে ঝামেলা সৃষ্টি হতে পারে। সন্তানকে এমন পরিস্থিতিতেও শান্তভাবে আচরণ করতে হবে। রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ করা পিতা মাতার প্রতি অবজ্ঞা হিসেবে গণ্য হয়। ইসলামে সন্তানের এই ধৈর্যই সবচেয়ে বড় সেবা হিসেবে গণ্য। ধৈর্যের মাধ্যমে সন্তান পিতা মাতার হৃদয়কে প্রশান্তি দেয় এবং নিজের জীবনের জন্যও বরকত অর্জন করে।

একজন সন্তানের উচিত তাদের পিতা মাতার কথা মেনে চলা।বিশেষ করে যখন তারা বয়সজনিত কারণে শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল। তাদের পরামর্শকে গুরুত্ব দেওয়া।সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহযোগিতা করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিজের সহযোগিতা প্রদর্শন করা সন্তানের কর্তব্য। পাশাপাশি সন্তানকে উচিত পিতা মাতার মান-সম্মান রক্ষা করা। সমাজে বা পরিবারের মধ্যে কখনও তাদের অবমাননা করা, অপমান করা বা নেগেটিভ মন্তব্য করা মেনে নেওয়া যায় না। এটি কেবল নৈতিক দায়ই নয়, ধর্মীয় দায়ও।

পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব পালনের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তাদের জন্য দোয়া করা। জীবিত অবস্থায় সন্তান যদি তাদের জন্য দোয়া করে, আল্লাহ তা তাদের জীবনে বরকত হিসেবে ফিরিয়ে দেন। মৃত অবস্থায় পিতা মাতার জন্য দোয়া ও সাদকায়ে জারিয়া দেওয়ার মাধ্যমে সন্তান তাদের কল্যাণে অবদান রাখতে পারে। এটি দেখায় যে সন্তানের দায়িত্ব কোনো অবস্থাতেই শেষ হয় না। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে এবং মৃত্যুর পরেও পিতা মাতার জন্য ভালো কিছু করা সম্ভব।

সমাজে পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব পালনকারী সন্তানের উপস্থিতি পরিবারে শান্তি, সমঝোতা ও সহমর্মিতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। সন্তান যত শ্রদ্ধাশীল হয়, পিতা মা তত সন্তুষ্ট ও আত্মবিশ্বাসী হয়। এটি পরিবারিক বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে। সন্তান যদি তাদের দায়িত্ব পালন না করে তবে তা পরিবারে দ্বন্দ্ব, মানসিক কষ্ট এবং সম্পর্কের অবনতি সৃষ্টি করে। তাই পিতা মাতার প্রতি দায়িত্বশীলতা কেবল পারিবারিক শান্তি নয়, সমাজের সুস্থ্য গঠনেরও এক অপরিহার্য ভিত্তি।

পিতা মাতার প্রতি দায়িত্বের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা অন্তর্ভুক্ত। সন্তানকে উচিত পিতা মাতার আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। বিশেষ করে যখন তারা অবসরপ্রাপ্ত বা অসুস্থ। এটি শুধু ভরণপোষণ নয়, তাদের মর্যাদা ও স্বাধীনতা রক্ষার একটি উপায়। সন্তানের উচিত তাদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি মানসিক ও আবেগগত নিরাপত্তা প্রদান করা। কখনও কখনও কিছু ছোট্ট কিছুর মাধ্যমে যেমন নিয়মিত যোগাযোগ, ভালোবাসার কথা বলা বা সময় ব্যয় করাও বড় সেবা হিসেবে গণ্য হয়।

পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব পালন করলে সন্তানের জীবনেও বরকত আসে। যে সন্তান তাদের কাছে সৎ, বিনয়ী ও শ্রদ্ধাশীল, আল্লাহ তায়ালা তাকে জীবনে স্থিতিশীলতা, শান্তি এবং সফলতা প্রদান করেন। এমন সন্তানকে সমাজও সম্মান দেয়। তারা পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়। এইভাবে পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব পালন এক প্রকার সামাজিক দায়বদ্ধতা ও নৈতিক দায়িত্বকে নিশ্চিত করে।

সন্তানের উচিত পিতা মাতার সাথে সম্পর্কের মধ্যে সদা ইতিবাচক মনোভাব রাখা। তাদের ভুলগুলোকে ক্ষমা করা, তাদের ভালোবাসা ও চেষ্টা চেনা এবং তাদের কষ্ট কমানোর চেষ্টা করা এগুলো দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। যখন সন্তান তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তাদের কাছে সময় ব্যয় করে, তখন পিতা মাতার জীবনে আনন্দ ও শান্তি আসে। এই আনন্দ ও শান্তিই সন্তানের জীবনে বরকত এবং সাফল্য বয়ে আনে।

পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্বের মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তাদের মানসিক ও সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করা। বৃদ্ধ বয়সে পিতা মা অনেক সময় নিজের শারীরিক দুর্বলতা ও অস্বস্তি নিয়ে হতাশ হয়ে পড়েন। তখন সন্তানকে প্রয়োজন তাদের পাশে থেকে সমর্থন করা, তাদের অনুভূতিকে গুরুত্ব দেওয়া এবং সমাজে তাদের সম্মান রক্ষা করা। সন্তান যদি এ দায়িত্ব পালন করে, তবে তা শুধু পারিবারিক বন্ধনকে শক্তিশালী করে না। বরং সমাজে নৈতিক আদর্শ স্থাপন করে।

একজন সন্তানের জন্য পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব পালন মানে তাদের দৈনন্দিন জীবনে সহযোগিতা করা। খাদ্য, স্বাস্থ্য, পরিবহন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোতে সহায়তা করা প্রয়োজন। এছাড়া তাদের সঙ্গী হওয়া, তাদের সঙ্গে আলাপচারিতা করা, তাদের আনন্দ ভাগাভাগি করা এগুলোও দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। বিশেষ করে, পিতা মাতার বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানকে উচিত এমনভাবে সহযোগিতা করা যাতে তাদের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ না হয়।

পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব পালনের সবচেয়ে সুন্দর দিক হলো তাদের প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। ছোট ছোট কাজ যেমন তাদের জন্য খাবার তৈরি করা, তাদের পছন্দের খাবার খাওয়ানো, তাদের সঙ্গে সময় কাটানো এসব কাজ বড় সেবা হিসেবে গণ্য হয়। সন্তান যদি সব সময় তাদের সাথে সদয় ও সহমর্মী হয়, তবে এটি পিতা মাতার জীবনকে শান্তি ও আনন্দে ভরিয়ে দেয়। আল্লাহ তায়ালা এমন সন্তানকে জীবনে বরকত দেন এবং তার প্রতিটি প্রয়াসকে সাফল্যে পরিণত করেন।

পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব পালনের মধ্যে নৈতিক দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানকে উচিত কখনও রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ না করা, তাদের প্রতি ধৈর্যশীল হওয়া এবং সবার আগে তাদের কথা শোনার চেষ্টা করা। পিতা মাতার ভুল বা সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করে সন্তানের উচিত কোমলভাবে আচরণ করা। এইভাবে সন্তান তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এবং পারিবারিক সম্পর্ককে সুসংহত রাখে।

একজন সন্তানের দায়িত্বের মধ্যে তাদের জন্য দোয়া করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জীবিত অবস্থায় সন্তান যদি তাদের জন্য দোয়া করে, আল্লাহ তা তাদের জীবনে বরকত হিসেবে ফিরিয়ে দেন। মৃত অবস্থায় পিতা মাতার জন্য দোয়া ও সাদকায়ে জারিয়া দেওয়ার মাধ্যমে সন্তান তাদের কল্যাণে অবদান রাখতে পারে। এটি দেখায় যে সন্তানের দায়িত্ব কোনো অবস্থাতেই শেষ হয় না। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে এবং মৃত্যুর পরেও পিতা মাতার জন্য ভালো কিছু করা সম্ভব।

সন্তানরা পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তাদের জীবনে এক ধরনের শান্তি এবং মানসিক প্রশান্তি লাভ করে। যখন পিতা মা সন্তুষ্ট ও আনন্দিত থাকেন, সন্তানও আত্মিকভাবে শান্ত থাকে। এটি শুধুমাত্র পারিবারিক শান্তি নয় বরং সমাজে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের দৃঢ় ভিত্তিও তৈরি করে। সন্তানের পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব পালন একটি নৈতিক ও ধর্মীয় দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বরকত বয়ে আনে।

পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব পালনে সমাজে আদর্শ স্থাপন করা যায়। যখন সন্তান তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তাদের সেবা করে এবং তাদের কথা শোনে, তখন অন্য সন্তানরাও এ আদর্শ অনুসরণ করে। এটি সমাজে নৈতিক সংস্কার ও মানবিক মূল্যবোধের বিস্তার ঘটায়। সেই সঙ্গে এটি পারিবারিক বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব পালনের মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তাদের শিক্ষাগত ও মানসিক দিক থেকে সহায়তা করা। অনেক সময় বৃদ্ধ বয়সে পিতা মা নতুন প্রযুক্তি বা সামাজিক পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নিতে পারেন না। সন্তানদের উচিত তাদের সহায়তা করা, তাদের সমস্যার সমাধান করতে সাহায্য করা এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া। এটি শুধু দায়িত্ব পালনের অংশ নয়, তাদের জীবনে আত্মবিশ্বাস ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি করে।

পরিশেষে পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব পালন জীবনের একটি নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব। এটি শুধুমাত্র ভরণপোষণ নয় মানসিক সান্ত্বনা, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, ধৈর্য্য এবং দোয়ার মাধ্যমে তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করা। সন্তানের এই দায়িত্ব পালনই পারিবারিক শান্তি, সামাজিক মর্যাদা ও আখিরাতের সফলতার মূল চাবিকাঠি। এক নিঃসন্দেহে বলা যায় পিতা মাতার প্রতি দায়িত্বশীলতা জীবনের সবচেয়ে মহৎ, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বদা পুরস্কৃত হওয়া কাজ।

পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্বের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো তাদের প্রতি ধারাবাহিক ভালোবাসা ও স্নেহ প্রদর্শন করা। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পিতা মা অনেক সময় শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন, তারা সহজে ক্লান্ত হয়, তাদের স্মৃতিশক্তি কমে আসে। সন্তানদের উচিত এমন সময়ে তাদের পাশে থাকা, তাদের প্রয়োজন বুঝে সাহায্য করা এবং তাদের অনুভূতির প্রতি সংবেদনশীল হওয়া। এই ধরণের দায়িত্বশীলতা সন্তানের চরিত্রকে আরও মানবিক ও দয়ালু করে তোলে।

সন্তানদের উচিত পিতা মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ করা। কথায় কোমলতা, আচরণে বিনয়, প্রয়োজনে সহযোগিতা এসবই তাদের প্রতি সন্তানের দায়বদ্ধতার অংশ। যখন সন্তান এই দায়িত্ব পালন করে, তখন পিতা মাতার জীবনে সুখ, শান্তি ও মানসিক প্রশান্তি আসে। এভাবে সন্তানের নিজের জীবনে শান্তি ও বরকতও বৃদ্ধি পায়।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে স্পষ্টভাবে বলেছেন, "আপনারা যদি তাদের সঙ্গে সদয় ও বিনয়ী আচরণ করেন, তবে তা আপনার কল্যাণে হবে।" এটি প্রতিটি সন্তানের জন্য এক মূল্যবান নীতি।

পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব পালন করা কেবল পারিবারিক বিষয় নয়, সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্বও। সন্তানের সেবা ও শ্রদ্ধা পরিবারের মধ্যে মমত্ববোধ বৃদ্ধি করে। যখন সন্তান তাদের প্রতি দয়ালু ও সহমর্মী হয়, পরিবারের সকল সদস্যে শান্তি ও সমঝোতা স্থাপিত হয়। এটি সমাজের নৈতিক আদর্শের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। পিতা মাতার প্রতি দায়িত্বশীল সন্তান সমাজে সম্মানিত হয় এবং অন্যদের জন্য আদর্শ স্থাপন করে।

পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব পালনের আরেকটি দিক হলো তাদের মানসিক স্বাস্থ্য ও আনন্দ নিশ্চিত করা। বৃদ্ধ বয়সে মানুষ মানসিকভাবে একাকী বোধ করতে পারেন। সন্তান যদি তাদের সঙ্গে সময় কাটায়, তাদের গল্প শোনে, তাদের আনন্দের মুহূর্ত ভাগাভাগি করে, তবে এটি তাদের জীবনে সুস্থতা ও সুখ বয়ে আনে। এটি ছোট কাজ মনে হলেও, এর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী। এমন দায়িত্ব পালন করা সন্তানের জন্যও বরকত বয়ে আনে। কারণ এটি ধৈর্য, ভালোবাসা ও সহমর্মিতার শিক্ষা দেয়।

পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব পালনের মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পিতা মা অনেক সময় নিজের দৈনন্দিন খরচ ও চিকিৎসা খরচ মেটাতে সমস্যায় পড়েন। সন্তানরা যদি তাদের আর্থিক সহযোগিতা করে, তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও চিকিৎসা নিশ্চিত করে, তবে এটি শুধু দায়িত্ব নয় তাদের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার প্রতিফলন। এভাবে সন্তান তাদের পাশে দাড়িয়ে পিতামাতার জীবনে স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা প্রদান করে।

সন্তানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো পিতা মাতার প্রতি ধৈর্যশীল হওয়া। কখনও কখনও বৃদ্ধ পিতা মা অপ্রয়োজনীয় অভিযোগ বা মন খারাপ করতে পারেন। সেই সময় সন্তানের উচিত শান্তভাবে তাদের কথা শোনা, তাদের মনোভাব বোঝা এবং সহমর্মিতার মাধ্যমে সমাধান দেওয়া। রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ করলে তা পিতা মাতার প্রতি অবজ্ঞা হিসেবে গণ্য হয়। ধৈর্যশীলতা ও নম্র আচরণই সন্তানের জন্য প্রকৃত সেবা।

পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব পালনের মধ্যে সবচেয়ে মহৎ কাজ হলো তাদের জন্য দোয়া করা। জীবিত অবস্থায় সন্তানের দোয়া তাদের জীবনে বরকত আনে। মৃত অবস্থায় পিতা মাতার জন্য দোয়া, সাদকায়ে জারিয়া, কোরআন তেলাওয়াত এগুলোও সন্তানের দায়িত্বের অংশ। এটি প্রমাণ করে যে পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব কখনো শেষ হয় না। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে এবং মৃত্যুর পরও সন্তানের কর্তব্য অব্যাহত থাকে।

পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব পালন করলে সন্তানের জীবনে এক ধরনের নৈতিক ও আত্মিক সমৃদ্ধি আসে। সন্তানের এই দায়িত্বশীলতা পরিবারে শান্তি ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করে, সমাজে নৈতিক আদর্শ স্থাপন করে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মানবিক মূল্যবোধ শেখায়। এক সৎ, দায়িত্বশীল এবং ধৈর্যশীল সন্তানই প্রকৃতভাবে পিতা মাতার মর্যাদা রক্ষা করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব পালন হলো জীবনের সবচেয়ে মহৎ এবং পূণ্যসাধক কাজ। এটি কেবল তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণ করা নয় তাদের মানসিক শান্তি, সামাজিক মর্যাদা ও আখিরাতের সাফল্যেরও প্রধান পথ। একজন নেক সন্তান যে তার পিতা মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, ধৈর্যশীল, সহমর্মী ও সেবামূলক আচরণ করে। সে শুধু পার্থিব জীবনে শান্তি লাভ করে না আখিরাতে আল্লাহর কাছে মহিমান্বিত পুরস্কারও লাভ করে।

সুতরাং প্রত্যেক সন্তানের উচিত তার পিতা মাতার প্রতি দায়িত্বশীলতা সর্বোচ্চ মাত্রায় পালন করা। জীবনের প্রতিটি সময় তাদের সেবা করা, শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা, ধৈর্য্য ধারণ করা, এবং তাদের জন্য দোয়া করা। এটাই মানব জীবনের সর্বোত্তম মূল্যবোধ। পিতা মাতার প্রতি দায়িত্বশীলতা জীবনকে পূর্ণতা দেয়, পরিবারকে দৃঢ় করে, সমাজকে নৈতিকভাবে সুসংহত করে এবং আল্লাহর কাছে সন্তানের মর্যাদা বৃদ্ধি করে। এটি এক অপরিহার্য ও মহৎ দায়িত্ব, যা প্রত্যেক সন্তানের জীবনে সর্বদা প্রাধান্য পাবে।

পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব, এটি হলো হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রবাহিত এক অমোঘ ভালোবাসার প্রকাশ। এক অনন্য বন্ধন যা আমাদের জীবনকে অর্থ দেয়। পিতা-মাতা যে ত্যাগ ও ভালোবাসা দিয়ে আমাদের বড় করেছেন, তা কোনো শব্দে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, দুঃখ-বেদনা সহ্য করার মানসিকতা, অসীম ধৈর্য ও প্রার্থনা সবই আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে ছায়ার মতো সাথে থাকে।

সন্তানের দায়িত্ব হলো সেই ভালোবাসা ও ত্যাগকে মূল্যায়ন করা, তাদের সম্মান করা।প্রয়োজনমতো পাশে থাকা এবং তাদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সুখ ও শান্তি প্রদানের চেষ্টা করা। যারা এই দায়িত্ব পালন করে তাদের জীবনে শান্তি, বরকত ও আনন্দ স্থায়ী হয়। আর যারা অবাধ্য হয় তাদের জীবন হয় দুঃখ ও শূন্যতার প্রতিফলন। এটি শুধু পারিবারিক সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করে না মানবিক মূল্যবোধকেও ক্ষুণ্ণ করে।

পিতামাতার প্রতি সন্তান হওয়া মানে শুধু জন্ম নেওয়া নয়।বরং জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে দায়িত্ব নেওয়া। প্রতিটি সন্তানের উচিত হৃদয়ে ধারণ করা যে পিতামাতার ভালোবাসা, প্রার্থনা ও

ত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করাই জীবনের সবচেয়ে মহৎ ও পূর্ণাঙ্গ অর্জন। তাদের মুখে হাসি ফোটানো, তাদের দুঃখ কমানো, তাদের জন্য প্রার্থনা করা এসবই আমাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য।

শেষ পর্যন্ত বলা যায় পিতামাতার সম্মান ও সেবা হলো মানবতার অন্যতম চূড়ান্ত শিক্ষা। তাদের প্রতি ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতা বজায় রাখা আমাদেরকে কেবল একজন ভাল সন্তান হিসেবে গড়ে তুলবে না একই সাথে আমাদের হৃদয়কে নরম, আমাদের মনকে উজ্জ্বল এবং আমাদের জীবনকে সত্যিকারের অর্থপূর্ণ করে তুলবে।